EHSANUL HOQUE SAJID

কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে

মানুষের অস্তিত্বের যাত্রা

সৃষ্টি · জীবন · মৃত্যু · হাশর · আখিরাত

সংকলন ও সম্পাদনা

ইহছানুল হক ছাজিদ

কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে

মানুষের অস্তিত্বের যাত্রা

সৃষ্টি থেকে আখিরাত পর্যন্ত

৬ পর্বে ধারাবাহিক যাত্রা

সংকলন ও সম্পাদনা

ইহছানুল হক ছাজিদ

এআই সহায়তায় প্রস্তুত; সম্পাদনা ও যাচাই: ইহছানুল হক ছাজিদ

কিছু কথা

ভূমিকা

মানুষ যখন নিজের দিকে তাকায়, তখন কিছু প্রশ্ন তাকে থামিয়ে দেয়—আমি কোথা থেকে এলাম? কেন এলাম? আর একদিন কোথায় যাব? "মানুষের অস্তিত্বের যাত্রা" এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজার একটি ধারাবাহিক আয়োজন।

ছয়টি পর্বে মানুষের পুরো যাত্রাকে ধাপে ধাপে সাজানো হয়েছে। প্রথম পর্বে আদম (আ.)-এর সৃষ্টি ও পৃথিবীতে মানুষের আগমন; দ্বিতীয় পর্বে মাতৃগর্ভ, রূহ ও মীসাকের আলোচনা; তৃতীয় পর্বে জীবনের উদ্দেশ্য ও পৃথিবীর পরীক্ষা। এরপর চতুর্থ পর্বে মৃত্যু, রূহের যাত্রা ও বরযখ; পঞ্চম পর্বে কিয়ামত, পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব ও মীযান; আর শেষ পর্বে জান্নাত ও জাহান্নাম—মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য।

এই বইয়ের মূল নীতি সতর্কতা। গায়েবের বিষয়ে কুরআন ও সহিহ হাদিসে যতটুকু এসেছে, ততটুকুই বলা হয়েছে; প্রচলিত গল্প বা অনুমানকে নিশ্চিত তথ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি। যেসব বিষয়ে আলেমদের মধ্যে ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে, সেখানেও সীমারেখা স্পষ্ট রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিটি পর্বের শেষে পরবর্তী পর্বের প্রশ্নগুলো সাজানো আছে, যাতে পাঠক যাত্রার ধারাবাহিকতা অনুভব করেন।

এই বইটি আমি এআই-এর সহায়তায় প্রস্তুত করেছি এবং নিজে সম্পাদনা করেছি। আয়াত ও হাদিসের সূত্র বইয়ের শেষে পর্ব অনুযায়ী দেওয়া আছে। নির্ভরযোগ্য আলেমের সহায়তায় সেগুলো যাচাই করে নিলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব; কোনো ভুল চোখে পড়লে জানাবেন। আল্লাহ এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আ-মীন।

ইহছানুল হক ছাজিদ

সম্পাদক

সূচিপত্র

ভূমিকা ৩

প্রথম অংশ — সৃষ্টি থেকে জীবনের উদ্দেশ্য পর্ব ১–৩

১ একেবারে শুরু ৬
আদম (আ.)-এর সৃষ্টি ও পৃথিবীতে মানুষের আগমন

২ জন্মের আগের আমি ১৫
মাতৃগর্ভ, রূহ ও মীসাক

৩ কেন পৃথিবীতে এলাম ? ২৪

দ্বিতীয় অংশ — মৃত্যু থেকে চূড়ান্ত গন্তব্য পর্ব ৪–৬

৪ যে মুহূর্তে পৃথিবীর জীবন থেমে যায় ৩৬
মৃত্যু ও রূহের যাত্রা

৫ পৃথিবী ভেঙে পড়বে ৪৫
পুনরুত্থান ও হাশরের দিন

৬ শেষ গন্তব্য ৫৭
জান্নাত ও জাহান্নাম

পরিশিষ্ট

উদ্ধৃত সূত্রসমূহ ৬৭

প্রথম অংশ

সৃষ্টি থেকে জীবনের উদ্দেশ্য

আদম (আ.)-এর সৃষ্টি, মাতৃগর্ভ, রূহ, মীসাক ও পৃথিবীর পরীক্ষা

পর্ব ১ – ৩

পর্ব ১

একেবারে শুরু

আদম (আ.)-এর সৃষ্টি ও পৃথিবীতে মানুষের আগমন

একদিন আপনি নিজের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন—আমি কোথা থেকে এলাম?

এই যে আমি পৃথিবীতে আছি, কথা বলছি, চিন্তা করছি, ভালোবাসছি, কষ্ট পাচ্ছি, স্বপ্ন দেখছি—এসবের শুরু কোথায়?

আমার জন্মের আগেও কি আমার কোনো ইতিহাস ছিল?

মানুষের এই প্রশ্ন নতুন নয়। যুগে যুগে মানুষ নিজের অস্তিত্বের রহস্য জানতে চেয়েছে। কিন্তু ইসলাম এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের জন্মের হাসপাতাল থেকে শুরু করে না; বরং নিয়ে যায় আরও অনেক দূরে—মানবজাতির প্রথম মানুষের কাছে।

সেই প্রথম মানুষ—আদম (আ.)।

তাঁর আগে কোনো মানুষ পৃথিবীতে হাঁটেনি। কোনো মানবসভ্যতা ছিল না, কোনো শহর ছিল না, কোনো জাতি ছিল না। তারপর আল্লাহ এমন এক সৃষ্টির সূচনা করলেন, যার বংশধর হয়ে একদিন আমরা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ব।

কুরআন সেই ঘটনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত আমাদের সামনে তুলে ধরে।

আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন,

> “নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি স্থাপন করতে যাচ্ছি।
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:৩০

ফেরেশতারা জানতে চাইলেন—পৃথিবীতে কি এমন কাউকে স্থাপন করা হবে, যে সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত করবে?

আল্লাহ বললেন,

> “ নিশ্চয়ই আমি জানি যা তোমরা জানো না।
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:৩০

এই ছোট্ট কথাটির মধ্যে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর একটি ইঙ্গিত রয়েছে। মানুষ পৃথিবীতে আসবে—তার মধ্যে কেউ অন্যায় করবে, কেউ রক্তপাত করবে; আবার এমন মানুষও থাকবে যারা ঈমান আনবে, আল্লাহর আনুগত্য করবে, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে এবং তাঁর হিদায়াত অনুসরণ করবে।

অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের আগমন কোনো অর্থহীন ঘটনা নয়।

কিন্তু তখনও আদম (আ.) পৃথিবীতে আসেননি।

আল্লাহ তাঁকে কী দিয়ে সৃষ্টি করবেন ?

কুরআন নিজেই তার উত্তর দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

> “ স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ‘আমি মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব।
>
> — সূরা সোয়াদ, ৩৮:৭১

আর অন্য আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে বলেছেন,

> “ নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের মতো। তিনি তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে বললেন, ‘হও’, ফলে সে হয়ে গেল।
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:৫৯

অর্থাৎ মানবজাতির প্রথম মানুষ কোনো মানব-পিতা বা মানব-মাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেননি। আল্লাহ তাঁকে মাটি থেকে সরাসরি সৃষ্টি করেছেন।

কুরআনের অন্য জায়গায় এই সৃষ্টির উপাদানকে আরও বিস্তারিত শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, "আর স্মরণ কর, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, 'আমি একজন মানুষ সৃষ্টি করতে যাচ্ছি শুকনো ঠনঠনে কালচে মাটি থেকে'।" (সূরা আল-হিজর, ১৫:২৮)

আবার সূরা আস-সাজদাহতে বলা হয়েছে,

> “ তিনি মানুষের সৃষ্টি শুরু করেছেন মাটি থেকে।
>
> — সূরা আস-সাজদাহ, ৩২:৭

তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত একত্র করলে আমরা বুঝতে পারি—আদম (আ.)-এর সৃষ্টির মূল উপাদান ছিল মাটি। বিভিন্ন আয়াতে মাটি, কাদা ও শুকনো মাটির বিভিন্ন অবস্থা বা বর্ণনা এসেছে।

এখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কুরআন আমাদের আদম (আ.)-এর সৃষ্টির প্রতিটি ধাপের এমন কোনো বিস্তারিত বিবরণ দেয়নি যে আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তার মধ্যে আরও অনেক ঘটনা যোগ করতে পারি। তাই যে অংশ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صلى الله عليه وسلم আমাদের জানিয়েছেন, আমরা ততটুকুই নিশ্চিতভাবে বলব। এর বাইরে কল্পনা করে কোনো দৃশ্য বা ঘটনা তৈরি করা ঠিক নয়।

আল্লাহ যখন আদম (আ.)-এর সৃষ্টি সম্পন্ন করলেন, তখন তাঁর জন্য একটি বিশেষ মর্যাদার বিষয় প্রকাশ পেল।

আল্লাহ ফেরেশতাদের বললেন,

> “ অতএব যখন আমি তাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেব এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার জন্য সিজদাবনত হও'।
>
> — সূরা আল-হিজর, ১৫:২৯

এখানে “আমার রূহ” কথাটি বুঝতে সতর্ক হতে হবে। এর অর্থ এই নয় যে আল্লাহর কোনো অংশ মানুষের মধ্যে প্রবেশ করেছে—আল্লাহ এসব ধারণা থেকে পবিত্র। এটি আল্লাহর সৃষ্টি করা রূহকে তাঁর সঙ্গে বিশেষ সম্মানসূচক সম্পর্কের মাধ্যমে উল্লেখ করা।

তারপর ঘটল এমন একটি ঘটনা, যা শুধু আদম (আ.)-এর ইতিহাস নয়; মানুষের পরবর্তী পুরো জীবনের ওপর যার প্রভাব রয়েছে।

আল্লাহ ফেরেশতাদের আদম (আ.)-কে সিজদা করতে বললেন।

ফেরেশতারা সবাই সিজদা করলেন।

কিন্তু একজন করল না।

সে ছিল ইবলিস।

কুরআন বলে,

> “ তারা সবাই সিজদা করল, ইবলিস ছাড়া। সে অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:৩৪

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার—ইবলিস ফেরেশতা ছিল না; সে ছিল জিনদের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন সূরা আল-কাহফের ১৮:৫০ আয়াতে এটি স্পষ্ট করেছে।

তাহলে সে কেন আল্লাহর আদেশ অমান্য করল ?

তার উত্তরও কুরআন আমাদের জানায়।

ইবলিস বলেছিল,

> “ আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১২

এক মুহূর্তে তার ভেতরের অহংকার প্রকাশ হয়ে গেল।

সে আল্লাহর আদেশকে মেনে নেওয়ার বদলে নিজের বিচারকে বড় করে দেখল। মাটি ও আগুনের মধ্যে তুলনা করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করল।

এখানেই মানুষের জন্য একটি ভয়ংকর শিক্ষা লুকিয়ে আছে—অহংকার মানুষকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে সে সত্য জানার পরও সত্যের সামনে মাথা নত করতে চায় না।

কিন্তু আদম (আ.)-কে আল্লাহ শুধু সৃষ্টি করেই থেমে যাননি। তাঁকে বিশেষ জ্ঞানও দান করেছিলেন।

আল্লাহ বলেন,

> “ আর তিনি আদমকে সব নাম শিক্ষা দিলেন।
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:৩১

তারপর ফেরেশতাদের সামনে সেসব উপস্থাপন করা হলো। ফেরেশতারা বললেন,

> “ আপনি পবিত্র! আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:৩২

“সব নাম” বলতে ঠিক কী কী বোঝানো হয়েছে—এ বিষয়ে তাফসিরে বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট তালিকাকে কুরআনের নিশ্চিত বক্তব্য হিসেবে বলা যায় না। নিশ্চিত বিষয় হলো, আল্লাহ আদম (আ.)-কে বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আদম (আ.)-এর শারীরিক গঠন সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم আমাদের একটি সহিহ তথ্য জানিয়েছেন।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন:

> “ আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত।

এরপর তাঁকে একদল ফেরেশতার কাছে গিয়ে সালাম দিতে বলা হয়। আদম (আ.) বললেন, “আস-সালামু আলাইকুম।” ফেরেশতারা জবাব দিলেন, “আস-সালামু আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ।” হাদিসে আরও এসেছে, জান্নাতে প্রবেশকারীরা আদম (আ.)-এর আকৃতিতে

প্রবেশ করবে এবং আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পর থেকে মানুষের দৈহিক উচ্চতা কমতে থেকেছে।

— সহিহ আল-বুখারি, হাদিস ৩৩২৬

এটি গায়েবের বিষয়। তাই এ বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব হলো—রাসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে জানিয়েছেন, সেভাবেই বিশ্বাস করা; নিজের অনুমান দিয়ে এর ব্যাখ্যা তৈরি না করা।

এবার আদম (আ.)-এর জীবনের আরেকটি অধ্যায় শুরু হলো।

আল্লাহ তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ দিলেন। তাঁদের বলা হলো, জান্নাতের খাবার ও নেয়ামত থেকে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করতে পারবেন। তবে একটি নির্দিষ্ট গাছের কাছে যেতে নিষেধ করা হলো।

কুরআন সেই গাছের নাম বলেনি। তাই সেটি ঠিক কোন গাছ ছিল—এ বিষয়ে প্রচলিত বিভিন্ন গল্পকে কুরআনের নিশ্চিত বক্তব্য হিসেবে বলা যাবে না।

আল্লাহ আদম (আ.)-কে আরও সতর্ক করে দিয়েছিলেন:

> “হে আদম, নিশ্চয় এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন তোমাদের উভয়কে জান্নাত থেকে কিছুতেই বের করে না দেয়, তাহলে তোমরা দুর্ভোগ পোহাবে’।
>
> — সূরা ত্ব-হা, ২০:১১৭

শত্রু কে—তা পরিষ্কার ছিল।

ইবলিস।

সে মানুষকে ভালোবাসে না। সে মানুষের পতন চায়।

কিন্তু মানুষকে পরীক্ষা করা হবে—এবং সেই পরীক্ষায় শয়তানও একটি বড় ভূমিকা পালন করবে।

তারপর ইবলিস আদম (আ.)-এর কাছে কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করল। কুরআন বলে, সে তাঁকে এমন এক গাছের কথা বলেছিল, যা নাকি চিরস্থায়িত্ব ও অবিনশ্বর রাজত্বের দিকে নিয়ে যাবে।

অবশেষে আদম (আ.) ও তাঁর স্ত্রী সেই গাছের ফল গ্রহণ করলেন।

কুরআন এরপর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানায়—আদম (আ.) ভুল করেছিলেন, কিন্তু তিনি আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছিলেন।

আল্লাহ বলেন,

> “ অতঃপর তাঁর রব তাঁকে মনোনীত করলেন, তাঁর তওবা কবুল করলেন এবং তাঁকে হিদায়াত দিলেন।
>
> — সূরা ত্ব-হা, ২০:১২২

এখানে মানুষের জন্য একটি গভীর শিক্ষা রয়েছে।

মানুষ ভুল করতে পারে। কিন্তু ভুল করার পর আল্লাহর দিকে ফিরে আসার দরজা বন্ধ নয়।

আদম (আ.)-এর ঘটনা শুধু মানুষের প্রথম ভুলের ঘটনা নয়; এটি তওবারও প্রথম বড় শিক্ষা।

এরপর এল সেই মুহূর্ত, যখন মানবজাতির পৃথিবীর জীবন শুরু হবে।

আল্লাহ বললেন,

> “ তোমরা উভয়েই জান্নাত হতে একসাথে নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু হবে। অতঃপর আমার পক্ষ থেকে যখন তোমাদের কাছে কোনো হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হবে না।
>
> — সূরা ত্ব-হা, ২০:১২৩

এখানে যেন মানুষের পৃথিবীর জীবনের পুরো পথটি এক বাক্যে বলে দেওয়া হলো।

পৃথিবীতে মানুষ আসবে।

এখানে থাকবে শত্রুতা, প্রলোভন, ভুল, পরীক্ষা ও সংগ্রাম।

কিন্তু আল্লাহ মানুষকে একা ছেড়ে দেবেন না।

হিদায়াত আসবে।

যে সেই হিদায়াত অনুসরণ করবে, সে পথ হারাবে না।

এই জায়গায় এসে আমাদের একটি ভুল ধারণা দূর করা প্রয়োজন। আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে আগমনকে শুধু "শাস্তি" হিসেবে দেখলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ হবে। কারণ আদম (আ.) সৃষ্টির আগেই আল্লাহ ফেরেশতাদের জানিয়েছিলেন যে তিনি পৃথিবীতে একজন খলিফা স্থাপন করবেন—সূরা আল-বাকারা, ২:৩০।

অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না।

পৃথিবী হবে মানুষের পরীক্ষার স্থান।

আর এখান থেকেই আমাদের নিজেদের গল্প শুরু হয়।

কুরআনে আল্লাহ বলেছেন:

> "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন, তার থেকেই তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।
>
> — সূরা আন-নিসা, ৪:১

আজ আমরা পৃথিবীর নানা দেশে বাস করি। আমাদের ভাষা আলাদা, চেহারা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, জাতি ও গোত্র আলাদা। কিন্তু আমাদের মানবিক উৎস এক।

আমরা সবাই সেই মানবজাতির অংশ, যার শুরু আদম (আ.) থেকে।

এখানে এসে আমাদের যাত্রা একটু থামাই।

এখন পর্যন্ত আমরা জানতে পারলাম—মানুষের ইতিহাস কোনো হাসপাতালের প্রসূতি কক্ষ থেকে শুরু হয়নি। মানবজাতির ইতিহাসের শুরু হয়েছে আদম (আ.)-এর সৃষ্টি দিয়ে। তাঁকে আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, জ্ঞান দিয়েছেন, ফেরেশতাদের সামনে তাঁর মর্যাদা প্রকাশ করেছেন, ইবলিস তাঁর প্রতি অহংকার করেছে, তাঁকে জান্নাতে রাখা হয়েছে, তিনি ভুল করেছেন, তওবা করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর জীবনের দিকে যাত্রা শুরু হয়েছে।

পরবর্তী পর্বের পথে

কিন্তু এখানেই আমাদের সবচেয়ে ব্যক্তিগত প্রশ্নটি সামনে আসে—

আদম (আ.)-এর সৃষ্টি তো বুঝলাম। কিন্তু আমি? আমি কীভাবে পৃথিবীতে এলাম?

আমি তো মাটি থেকে সরাসরি তৈরি হইনি।

আমার জন্ম হয়েছে একজন মায়ের গর্ভে।

আমার অস্তিত্বের শুরু কোথায়?

আমি জন্মের আগে কোথায় ছিলাম?

আমার শরীর কীভাবে তৈরি হলো?

রূহ কখন এলো?

আর কুরআন যখন বলে মানুষের সৃষ্টি মায়ের গর্ভে ধাপে ধাপে ঘটে—সেটি কীভাবে বুঝতে হবে?

এর সঙ্গে কি আধুনিক ভ্রূণবিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক আছে?

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—

জন্মেরও আগে কি আমার কোনো অস্তিত্ব ছিল?

এই প্রশ্ন আমাদের নিয়ে যাবে মানুষের অস্তিত্বের আরও গভীরে—মাতৃগর্ভ, নুতফাহ, আলাকা, মুদগাহ, রূহ এবং মীসাকের আলোচনা পর্যন্ত।

সেখান থেকেই শুরু হবে আমাদের যাত্রার পরবর্তী অধ্যায়।

পর্ব ২

জন্মের আগের আমি

মাতৃগর্ভ, রূহ ও মীসাক

আদম (আ.)-এর সৃষ্টি দিয়ে মানবজাতির ইতিহাস শুরু হয়েছিল। কিন্তু আজ পৃথিবীতে যত মানুষ আছে, তাদের প্রত্যেকের গল্প কি আদম (আ.)-এর মতো?

না।

আদম (আ.)-কে আল্লাহ মাটি থেকে সরাসরি সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী বংশধরদের সৃষ্টি হলো ভিন্ন এক নিয়মে। আমরা মায়ের গর্ভে বেড়ে উঠি, তারপর পৃথিবীতে জন্ম নিই।

তাই এবার প্রশ্নটা আরও ব্যক্তিগত হয়ে যায়—

আমার অস্তিত্বের শুরু কোথায়?

আমি যখন পৃথিবীতে আসিনি, তখন আমি কোথায় ছিলাম?

আমার শরীর কীভাবে তৈরি হলো?

আমার রূহ কখন এলো?

আর আমি কি পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার আগেই আল্লাহকে চিনতাম?

এই প্রশ্নগুলোর কিছু উত্তর কুরআন ও সহিহ হাদিস আমাদের খুব স্পষ্টভাবে দিয়েছে। আবার কিছু বিষয়ে মানুষ অনেক কথা বলে, কিন্তু সেগুলোর সবগুলো ইসলামের নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই এখানে আমাদের খুব সতর্কভাবে এগোতে হবে।

কুরআন প্রথমেই আমাদের একটি বিস্ময়কর সত্য মনে করিয়ে দেয়:

> “ মানুষের ওপর কি এমন এক সময় অতিবাহিত হয়নি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তুই ছিল না?
>
> — সূরা আল-ইনসান, ৭৬:১

অর্থাৎ আজ যে মানুষ নিজের অস্তিত্ব নিয়ে এত চিন্তা করে, তারও এমন একটি সময় ছিল যখন সে পৃথিবীতে পরিচিত কোনো সত্তা ছিল না।

সে তখন মানুষের চোখে দৃশ্যমান ছিল না।

তার কোনো নাম ছিল না।

কোনো পরিচয় ছিল না।

কোনো পরিবার ছিল না।

কোনো ঘর ছিল না।

কোনো সম্পদ ছিল না।

কোনো দুঃখ বা আনন্দের অভিজ্ঞতাও ছিল না।

কিন্তু আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে সে কখনোই ছিল না।

মানুষের সৃষ্টির ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

> “ অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু হিসেবে এক নিরাপদ স্থানে স্থাপন করেছি।
>
> — সূরা আল-মুমিনূন, ২৩:১৩

এখানে “নিরাপদ স্থান” বলতে মায়ের গর্ভকে বোঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ মানুষের পৃথিবীতে দৃশ্যমান হওয়ার অনেক আগে তার যাত্রা শুরু হয় মায়ের গর্ভে।

কুরআন এই সৃষ্টির ধারাকে আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে:

> “ অতঃপর আমি শুক্রবিন্দুকে আলাকাহতে পরিণত করেছি; তারপর আলাকাহকে মুদগাহতে পরিণত করেছি; এরপর মুদগাহ থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি; তারপর অস্থিকে গোস্ত দ্বারা আবৃত করেছি; এরপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিতে পরিণত করেছি। অতএব বরকতময় আল্লাহ, যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।
>
> — সূরা আল-মুমিনূন, ২৩:১৪

এখানে কয়েকটি আরবি শব্দ এসেছে, যেগুলোর অর্থ বুঝলে আয়াতটির ধারাবাহিকতা আরও পরিষ্কার হয়।

নুতফাহ (نُطْفَة)—অতি সামান্য তরলবিন্দু।

আলাকাহ (عَلَقَة)—কুরআনের ব্যবহারে এমন এক পর্যায়, যার সঙ্গে লেগে থাকা বা ঝুলে থাকার অর্থের সম্পর্ক রয়েছে।

মুদগাহ (مُضْغَة)—চিবানো মাংসের ছোট টুকরার মতো একটি পর্যায়।

তবে এখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কুরআনের এই শব্দগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আধুনিক ভ্রূণবিজ্ঞানের কোনো নির্দিষ্ট চিত্রকে জোর করে প্রতিটি শব্দের সঙ্গে একেবারে এক-এক করে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব না। কুরআনের মূল উদ্দেশ্য এখানে মানুষের সৃষ্টির ধাপগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহর ক্ষমতা ও মানুষের অসহায়ত্ব উপলব্ধি করানো।

আধুনিক ভ্রূণবিজ্ঞানও নিশ্চিতভাবে দেখায় যে মানবভ্রূণ গর্ভধারণের পর ধারাবাহিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্যকে কুরআনের আয়াতের অর্থ বানিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। বরং বলা যায়—কুরআন তার নিজস্ব ভাষায় মানুষের সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক বিকাশের কথা বলেছে, আর আধুনিক বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে ভ্রূণের বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছে।

এবার সহিহ হাদিসে আসি।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন:

> “তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি এমন যে, তার সৃষ্টির উপাদান তার মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন একত্রিত থাকে। তারপর অনুরূপ সময় সে আলাকাহ হয়, তারপর অনুরূপ সময় মুদগাহ হয়। এরপর একজন ফেরেশতা প্রেরিত হন; তাঁকে চারটি বিষয় লিখে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়—তার রিজিক, তার আয়ু, তার আমল এবং সে সৌভাগ্যবান হবে নাকি দুর্ভাগা। তারপর তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয়।
>
> — সহিহ আল-বুখারি, ৩২০৮; সহিহ মুসলিম, ২৬৪৩

এই হাদিস আমাদের মানুষের গর্ভকালীন সৃষ্টি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় জানায়।

প্রথমত, মানুষের সৃষ্টি একটি পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়া।

দ্বিতীয়ত, মানুষের জীবন ও তার ভবিষ্যৎ আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে নয়।

তৃতীয়ত, হাদিসে রূহ ফুঁকে দেওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

চতুর্থত, মানুষের রিজিক, আয়ু ও আমল সম্পর্কে আল্লাহর পূর্বজ্ঞান ও তাকদিরের বিষয়টি এখানে এসেছে।

তবে তাকদিরের অর্থ এই নয় যে মানুষকে জোর করে পাপ করানো হয়। মানুষ পৃথিবীতে ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের অধিকার নিয়ে পরীক্ষা দেবে—এ বিষয়টি কুরআনের অন্যান্য আয়াতে স্পষ্ট।

এখানে আমাদের যাত্রা আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে।

রূহ কী ?

কুরআন নিজেই বলে:

> “ তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, ‘রূহ আমার রবের আদেশের অন্তর্ভুক্ত ; আর তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে অতি সামান্য।’
>
> — সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮৫

অর্থাৎ রূহের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান সীমিত।

আমরা জানি—রূহ আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানুষের জীবনের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু রূহের প্রকৃত প্রকৃতি, তার পূর্ণ বাস্তবতা এবং তার অদৃশ্য জগতের অবস্থা সম্পর্কে আমরা যতটুকু ওহির মাধ্যমে জেনেছি, ততটুকুই বলব।

এখানেই একটি ভুল ধারণা এড়িয়ে চলা জরুরি।

অনেকে বলেন, “মানুষ জন্মের আগে আলমুল আরওয়াহ বা আত্মার জগতে ছিল; সেখানে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে আল্লাহর বিস্তারিত কথোপকথন হয়েছিল; এরপর সবাই পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে।”

এই বক্তব্যের কিছু অংশ একটি গুরুত্বপূর্ণ কুরআনি আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও, এভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনি হিসেবে বলা কুরআন ও সহিহ হাদিস দ্বারা বিস্তারিতভাবে প্রমাণিত নয়।

কুরআনে অবশ্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ বলেন:

> “ আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব আদম-সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন

> —'আমি কি তোমাদের রব নই?' তারা বলল, 'অবশ্যই, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি।'
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৭২

এই ঘটনাকে ইসলামী পরিভাষায় মীসাক—অঙ্গীকার বা অঙ্গীকার গ্রহণ—বলা হয়।

কিন্তু এই আয়াত কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল, প্রত্যেক মানুষের আত্মাকে ঠিক কীভাবে বের করা হয়েছিল, কোথায় তাদের রাখা হয়েছিল, তারা পৃথিবীতে আসার আগে কী কী দেখেছিল —এসব বিষয়ে মানুষের মধ্যে বহু বর্ণনা ও ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে।

এখানে আমাদের থামতে হবে।

কারণ যে বিষয় কুরআন ও সহিহ হাদিস বিস্তারিতভাবে বলেনি, সেখানে কল্পনার সাহায্যে গায়েবের জগতের পূর্ণ ছবি আঁকা ঠিক নয়।

আলেমদের মধ্যে এই আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়েও আলোচনা রয়েছে। কেউ আয়াতটিকে আদম (আ.)-এর বংশধরদের কাছ থেকে বাস্তব সাক্ষ্য গ্রহণের ঘটনা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন; আবার কেউ মানুষের মধ্যে আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকার করার ফিতরাত বা স্বভাবগত প্রস্তুতির সঙ্গে এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন। তাই এটিকে এমনভাবে বলা উচিত নয় যে, "প্রত্যেক মানুষ জন্মের আগে পৃথিবীর মতো একটি আলাদা জগতে সম্পূর্ণ সচেতন জীবন কাটিয়েছিল"—এটি নিশ্চিত ইসলামী তথ্য।

এটি প্রমাণ করার মতো সুস্পষ্ট সহিহ দলিল আমাদের কাছে নেই।

বরং নিশ্চিতভাবে যা বলা যায় তা হলো—আল্লাহ আদম-সন্তানদের কাছ থেকে তাঁর রব হওয়ার বিষয়ে সাক্ষ্য নিয়েছেন, এবং কুরআন এই ঘটনাকে মানুষের বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন অজুহাত না থাকার সঙ্গে যুক্ত করেছে।

তাহলে জন্মের আগে আমরা কী ছিলাম?

একটি গুরুত্বপূর্ণ উত্তর কুরআন নিজেই দিয়েছে।

আমরা পৃথিবীতে পরিচিত মানুষ হিসেবে ছিলাম না।

আল্লাহ বলেন:

> "মানুষের ওপর কি এমন এক সময় অতিবাহিত হয়নি, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তুই ছিল না?

— সূরা আল-ইনসান, ৭৬:১

আর আমাদের অস্তিত্বের গর্ভকালীন পর্যায় সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন—তিনি আমাদের নুতফা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তারপর পর্যায়ক্রমে বিকশিত করেছেন।

অতএব "জন্মের আগে আমি কোথায় ছিলাম ?"—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের দুটি বিষয় আলাদা করতে হবে।

একটি হলো মানুষের শারীরিক সৃষ্টি—যার বিষয়ে কুরআন ও সহিহ হাদিসে সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে।

অন্যটি হলো রূহের অদৃশ্য জগতের বিস্তারিত অবস্থা—যার ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান সীমিত।

এই সীমাবদ্ধতাটিই মেনে নেওয়া ঈমানের অংশ।

আমরা সবকিছু জানি না।

আল্লাহ বলেন:

> "তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে অতি সামান্য।
>
> — সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮৫

এখন আবার মায়ের গর্ভে ফিরে আসি।

সেখানে তখন কেউ জানে না যে একটি নতুন মানুষ আসছে।

বাইরের পৃথিবী তার সম্পর্কে কিছুই জানে না।

কিন্তু আল্লাহ জানেন।

সে ছেলে হবে না মেয়ে—আল্লাহ জানেন।

তার রিজিক কতটুকু—আল্লাহ জানেন।

তার আয়ু কত—আল্লাহ জানেন।

সে কী কী কাজ করবে—আল্লাহ জানেন।

সহিহ হাদিসে এসেছে, নির্দিষ্ট পর্যায়ে ফেরেশতাকে এসব বিষয় লিখে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী নয়।

কারণ পৃথিবীতে তাকে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। আল্লাহ বলেন:

> “ বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।
>
> — সূরা আল-মুলক, ৬৭:১-২

অর্থাৎ আমাদের জন্ম কেবল বেঁচে থাকার জন্য নয়।

আমাদের সামনে একটি পরীক্ষা অপেক্ষা করছে।

আর সেই পরীক্ষার জন্যই আমাদের পৃথিবীতে পাঠানো হবে।

কিন্তু তার আগে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে।

একজন শিশু যখন পৃথিবীতে জন্ম নেয়, তখন সে কী অবস্থায় থাকে ?

সে কি পাপী হয়ে জন্মায় ?

সে কি কোনো ধর্মের পরিচয় নিয়ে জন্মায় ?

নাকি তার মধ্যে আল্লাহকে চেনার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে ?

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন:

> “ প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে।

এরপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজক করে তোলে—এমন উদাহরণ রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم দিয়েছেন।

— সহিহ আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিম

ফিতরাত বলতে মানুষের মধ্যে আল্লাহপ্রদত্ত স্বাভাবিক প্রবণতা ও প্রকৃতিগত প্রস্তুতিকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে তার মধ্যে সত্য গ্রহণ ও তার স্রষ্টার দিকে ফিরে যাওয়ার একটি স্বাভাবিক ভিত্তি রয়েছে।

তাই একটি শিশু যখন পৃথিবীতে আসে, তখন তার সামনে অতীতের কোনো পাপের বোঝা থাকে না।

তারপর ধীরে ধীরে সে পৃথিবীকে চিনতে শেখে।

মাকে চিনে।

বাবাকে চিনে।

ভাষা শেখে।

মানুষের আচরণ দেখে।

ভালো-মন্দের ধারণা তৈরি হয়।

তারপর একদিন সে বুঝতে শেখে—আমি কে?

কিন্তু তখনও তার জীবনের আসল পরীক্ষা পুরোপুরি শুরু হয়নি।

শৈশব পেরিয়ে সে বড় হবে।

তার বুদ্ধি পরিণত হবে।

তার সামনে ভালো ও মন্দের পথ খুলে যাবে।

শয়তান তাকে প্ররোচিত করবে।

নবী-রাসূলদের মাধ্যমে হিদায়াত মানুষের কাছে পৌঁছাবে।

তারপর মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—সে কোন পথে যাবে?

কিন্তু তার আগে তাকে পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে।

মাতৃগর্ভের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আলোয়।

একটি শিশু প্রথমবার পৃথিবীর বাতাস গ্রহণ করবে।

যে মানুষটি একসময় কারও কাছে পরিচিত ছিল না, সে তখন একটি নাম পাবে।

একটি পরিবার পাবে।

একটি পৃথিবী পাবে।

আর তার সামনে খুলে যাবে জীবনের দীর্ঘ পথ।

তখনও সে জানবে না তার জীবন কতদিনের।

সে জানবে না তার সামনে কী কী ঘটনা অপেক্ষা করছে।

সে জানবে না কোন মানুষ তাকে ভালোবাসবে, কে তাকে কষ্ট দেবে।

সে জানবে না কত সম্পদ আসবে, কত কিছু হারাবে।

সে জানবে না তার জীবনের শেষ দিনটি কখন।

কিন্তু আল্লাহ জানেন।

এবং একদিন সেই শিশুই বড় হয়ে নিজের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির সামনে দাঁড়াবে —

“আমি কেন পৃথিবীতে এসেছি?”

এই প্রশ্নের উত্তর না জানা পর্যন্ত মানুষের অস্তিত্বের যাত্রা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

কারণ আমরা কোথা থেকে এসেছি—এটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি গুরুত্বপূর্ণ হলো কেন এসেছি।

পরবর্তী পর্বের পথে

পরবর্তী পর্বে আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজব।

কেন আল্লাহ আমাদের পৃথিবীতে পাঠালেন?

আমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য কী?

শুধু খাওয়া, ঘুমানো, পড়াশোনা, চাকরি, পরিবার, অর্থ, আনন্দ আর দুঃখ—এটাই কি মানুষের জীবন?

নাকি এর পেছনে আরও বড় কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে?

কুরআন সেই প্রশ্নের উত্তর খুব সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর একটি আয়াতে দিয়েছে—

> আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। — সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬

সেখান থেকেই শুরু হবে আমাদের যাত্রার পরবর্তী অধ্যায়—“কেন পৃথিবীতে এলাম?”

পর্ব

৩ কেন পৃথিবীতে এলাম?

একটি শিশু যখন পৃথিবীতে জন্ম নেয়, তখন তার সামনে একটি বিশাল পৃথিবী খুলে যায়।

সে জানে না পৃথিবী কী।

সে জানে না জীবন কী।

সে জানে না মৃত্যু কী।

সে জানে না কেন তাকে এখানে আনা হয়েছে।

ধীরে ধীরে সে বড় হয়। হাঁটতে শেখে, কথা বলতে শেখে, পড়াশোনা করে, স্বপ্ন দেখতে শেখে। একসময় সে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে শুরু করে।

কেউ ডাক্তার হতে চায়, কেউ শিক্ষক, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ বিজ্ঞানী। কেউ অর্থের পেছনে ছুটে, কেউ খ্যাতির পেছনে। কেউ পরিবার গড়ে, কেউ জ্ঞান অর্জন করে, কেউ পৃথিবীকে বদলে দিতে চায়।

কিন্তু এত কিছুর ভেতরেও একটি প্রশ্ন থেকে যায়—

এসবের আগে আমার আসল উদ্দেশ্য কী ?

আমি কেন বেঁচে আছি ?

আমি কেন পৃথিবীতে এসেছি ?

শুধু খাওয়া, ঘুমানো, পড়াশোনা, চাকরি, অর্থ উপার্জন, পরিবার, আনন্দ-বেদনা—এই কি মানুষের জীবনের শেষ কথা ?

কুরআন এই প্রশ্নের উত্তর খুব স্পষ্টভাবে দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

> “ আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

> — সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬

এখানে ইবাদত শব্দটির অর্থ শুধু নামাজ, রোজা বা কিছু নির্দিষ্ট ধর্মীয় কাজ নয়। ইবাদত হলো আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য ও রব হিসেবে মেনে তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জীবন পরিচালনা করা।

অর্থাৎ নামাজ ইবাদত।

রোজা ইবাদত।

কুরআন পড়া ইবাদত।

আল্লাহকে স্মরণ করা ইবাদত।

সত্য কথা বলা ইবাদত।

হালালভাবে উপার্জন করা ইবাদত হতে পারে।

মা-বাবার সঙ্গে উত্তম আচরণ ইবাদত।

মানুষের উপকার করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে—যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং শরিয়তসম্মতভাবে করা হয়।

তাহলে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য শুধু মসজিদের ভেতরের কয়েকটি কাজ নয়; বরং পুরো জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যের অধীনে নিয়ে আসা।

কুরআন অন্য জায়গায় আরও একটি বিষয় জানায়।

আল্লাহ বলেন,

> “ বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান। যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।
>
> — সূরা আল-মুলক, ৬৭:১–২

লক্ষ করুন—আল্লাহ বলেননি, “কে সবচেয়ে বেশি কাজ করে।”

বলেছেন,

“কে আমলের দিক থেকে উত্তম।”

অর্থাৎ শুধু কাজের সংখ্যা নয়; কাজের মান, উদ্দেশ্য ও সঠিকতা গুরুত্বপূর্ণ।

একজন মানুষ অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু যদি তার কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না হয় অথবা অন্যায় পথে করা হয়, তাহলে সেই কাজ তাকে প্রকৃত সফলতার দিকে নিয়ে যাবে না।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> “ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের দিকে তাকান।
>
> — সহিহ মুসলিম, ২৫৬৪

তাই পৃথিবীর চোখে একজন মানুষ কত বড়—এটি আসল বিষয় নয়।

তার কত টাকা আছে—এটিও শেষ কথা নয়।

তার চেহারা কেমন—সেটিও নয়।

তার পরিচিতি কত দূর পর্যন্ত—সেটিও নয়।

আসল বিষয় হলো—

তার অন্তর কেমন এবং তার আমল কেমন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে—যদি আল্লাহ আমাদের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করে থাকেন, তাহলে আল্লাহর কি আমাদের ইবাদতের প্রয়োজন আছে?

না।

আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন।

মানুষ ইবাদত করে নিজের কল্যাণের জন্য।

নামাজ আল্লাহর প্রয়োজন নয়; মানুষের প্রয়োজন।

তওবা আল্লাহর প্রয়োজন নয়; মানুষের প্রয়োজন।

আল্লাহকে স্মরণ করা আল্লাহর কোনো ঘাটতি পূরণ করে না; বরং মানুষের অন্তরকে জীবিত রাখে।

এই কারণেই পৃথিবীর জীবনকে শুধু আনন্দের জায়গা হিসেবে দেখলে কুরআনের বক্তব্য অসম্পূর্ণ বোঝা হবে।

পৃথিবী হলো পরীক্ষার স্থান।

কখনো সুখ দিয়ে পরীক্ষা করা হবে।

কখনো দুঃখ দিয়ে।

কখনো সম্পদ দিয়ে।

কখনো দারিদ্র্য দিয়ে।

কখনো সুস্থতা দিয়ে।

কখনো অসুস্থতা দিয়ে।

কখনো সাফল্য দিয়ে।

কখনো ব্যর্থতা দিয়ে।

কখনো এমন কিছু দেওয়া হবে যা মানুষ চেয়েছিল, আবার কখনো এমন কিছু থেকে বঞ্চিত করা হবে যা সে খুব ভালোবাসত।

আল্লাহ বলেন,

> “ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা এবং সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষতি দিয়ে। আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও।
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৫

তাহলে জীবনের কষ্ট মানেই আল্লাহ মানুষকে ছেড়ে দিয়েছেন—এমন নয়।

কখনো কষ্টও পরীক্ষা।

আবার সুখও পরীক্ষা।

একজন মানুষ বিপদে পড়ে কী করে—সেটিও পরীক্ষা।

আরেকজন প্রচুর সম্পদ পেয়ে কী করে—সেটিও পরীক্ষা।

একজন ক্ষমতা পেয়ে কেমন আচরণ করে—সেটিও পরীক্ষা।

একজন দুর্বল মানুষের সঙ্গে কেমন আচরণ করে—সেটিও পরীক্ষা।

এমনকি মানুষ যখন একা থাকে এবং মনে করে কেউ তাকে দেখছে না—সেই মুহূর্তও তার জন্য পরীক্ষা।

কারণ আল্লাহ বলেন,

> “ তোমরা তোমাদের কথা গোপন কর অথবা তা প্রকাশ কর, নিশ্চয় তিনি অন্তরসমূহে যা আছে সে বিষয়ে সম্যক অবগত। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না ? অথচ তিনি অতি সূক্ষ্মদর্শী, পূর্ণ অবহিত।
>
> — সূরা আল-মুলক, ৬৭:১৩–১৪

মানুষ পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে, সিদ্ধান্ত নেয়, পছন্দ করে। কিন্তু তার স্বাধীনতা সীমাহীন নয়।

সে চাইলে ভালো কাজ করতে পারে।

চাইলে মন্দ কাজও করতে পারে।

কিন্তু প্রতিটি সিদ্ধান্তের পরিণতি আছে।

কুরআন বলে,

> “ যে অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে অণু পরিমাণ অসৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।
>
> — সূরা আয-যিলযাল, ৯৯:৭–৮

এ কারণেই মানুষের জীবনকে খেলাচ্ছলে কাটিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই।

আমরা এখানে শুধু সময় কাটাতে আসিনি।

আমরা এমন এক জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে এসেছি, যার শুরু হবে মৃত্যুর পর।

কিন্তু মানুষ তো সহজেই ভুলে যায়।

সে যখন পৃথিবীতে আসে, তখন তার সামনে মৃত্যু অনেক দূরের বিষয় মনে হয়।

শিশু ভাবে—জীবন অনেক লম্বা।

যুবক ভাবে—এখনও অনেক সময় আছে।

বৃদ্ধ যখন পেছনে তাকান, তখন বুঝতে পারেন—সময় কত দ্রুত চলে গেছে।

কুরআন পৃথিবীর জীবনকে তাই বারবার সাময়িক বলে মনে করিয়ে দেয়।

আল্লাহ বলেন,

> তোমরা জেনে রাখ যে, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়।
>
> — সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:২০

এর অর্থ এই নয় যে পৃথিবীর সবকিছুই নিষিদ্ধ বা অর্থহীন।

পরিবার প্রয়োজন।

হালাল উপার্জন প্রয়োজন।

জ্ঞান অর্জন প্রয়োজন।

সমাজ গঠন প্রয়োজন।

মানুষের উপকার করা প্রয়োজন।

কিন্তু সমস্যা তখনই শুরু হয়, যখন সাময়িক জিনিসকে চূড়ান্ত লক্ষ্য বানিয়ে ফেলি।

একজন মানুষ যদি টাকা উপার্জন করে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, পরিবারকে হালালভাবে পরিচালনা করে, মানুষের উপকার করে—তাহলে তার দুনিয়ার কাজও আখিরাতের পাথেয় হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু কেউ যদি দুনিয়াকেই জীবনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বানিয়ে ফেলে, তখন সে আসল গন্তব্য ভুলে যায়।

কুরআন বলে,

> “ আর আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন—যদি তারা জানত!
>
> — সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:৬৪

তাহলে পৃথিবীর জীবন কী?

এটি প্রস্তুতির সময়।

এটি পরীক্ষার সময়।

এটি আমল করার সময়।

আর মৃত্যুর পর?

তখন আমল করার সুযোগ শেষ হয়ে যাবে।

এই কারণেই আল্লাহ মানুষকে শুধু পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেননি; তাঁকে পথও দেখিয়েছেন।

কারণ একজন মানুষকে যদি বলা হয়, “তোমার পরীক্ষা আছে”, কিন্তু পরীক্ষার বিষয় কী, কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে—কিছুই না বলা হয়, তাহলে তা ন্যায়সঙ্গত হবে না।

আল্লাহ তাই মানুষের কাছে হিদায়াত পাঠিয়েছেন।

আদম (আ.)-এর পৃথিবীতে আগমনের সময়ই আল্লাহ বলেছিলেন:

> “ অতঃপর আমার পক্ষ থেকে যখন তোমাদের কাছে কোনো হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হবে না।
>
> — সূরা ত্ব-হা, ২০:১২৩

তারপর যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ এসেছেন।

মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকতে।

তাওহিদ শেখাতে।

ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝাতে।

আল্লাহর বিধান জানাতে।

মানুষকে সতর্ক করতে।

এবং আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে।

আল্লাহ বলেন,

> “ আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছি—এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে দূরে থাকো।
>
> — সূরা আন-নাহল, ১৬:৩৬

এখানে তাগুত বলতে এমন সব কিছু বোঝায় যা আল্লাহর সীমা অতিক্রম করে উপাসনা, আনুগত্য বা কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিরোধী অবস্থান নেয়।

আদম (আ.) থেকে শুরু করে অসংখ্য নবী-রাসূল মানুষকে একই মৌলিক সত্যের দিকে ডাকতে এসেছেন—আল্লাহ এক, তাঁরই ইবাদত করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> “ নবীগণ পরস্পর পিতৃভ্রাতার মতো; তাদের মায়েরা ভিন্ন, কিন্তু তাদের দ্বীন এক।
>
> — সহিহ আল-বুখারি, ৩৪৪৩

অর্থাৎ যুগে যুগে শরিয়তের কিছু বিধান ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু নবীদের মূল দাওয়াত ছিল এক —তাওহিদ ও আল্লাহর আনুগত্য।

এখানে এসে মানুষের জীবনের একটি বড় বাস্তবতা সামনে আসে।

আমাদের প্রত্যেকের সামনে দুটি শক্তিশালী আহ্বান থাকে।

একদিকে আল্লাহর হিদায়াত।

অন্যদিকে শয়তানের প্ররোচনা।

শয়তান মানুষের শত্রু। সে মানুষকে এমনভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়, যাতে মানুষ তার নিজের স্রষ্টাকেই ভুলে যায়।

কিন্তু শয়তান মানুষকে জোর করে পাপ করাতে পারে না।

সে প্ররোচিত করে, আকর্ষণ তৈরি করে, ভুলকে সুন্দর করে দেখায়।

আর মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এই কারণেই কুরআন শয়তানের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে:

> “ সে বলল, ‘আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব।
>
> — সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৬

কিন্তু শয়তানের বিরুদ্ধে মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো—আল্লাহর হিদায়াত, ঈমান, তাকওয়া ও তওবা।

মানুষ ভুল করতে পারে।

কখনো পাপেও পড়ে যেতে পারে।

কিন্তু একজন মুমিনের জীবন পাপের পর শেষ হয়ে যায় না।

সে ফিরে আসতে পারে।

ক্ষমা চাইতে পারে।

তওবা করতে পারে।

আল্লাহর দিকে আবার ফিরে যেতে পারে।

এই কারণেই পৃথিবীর জীবন শুধু “কে কখনো ভুল করবে না”—তার পরীক্ষা নয়।

বরং কে ভুলের পর আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, সেটিও পরীক্ষার অংশ।

আর এখানেই মানুষের জীবনের সৌন্দর্য।

সে ফেরেশতা নয়।

সে ভুল করতে পারে।

তার প্রবৃত্তি আছে।

তার দুর্বলতা আছে।

তার আকাঙ্ক্ষা আছে।

তার রাগ আছে।

তার ভয় আছে।

তার লোভ আছে।

কিন্তু তার কাছে বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, হিদায়াত আছে, তওবার দরজা আছে।

তাই একজন মানুষ আজ যত নিচেই থাকুক, আল্লাহর দিকে ফিরে আসার মাধ্যমে তার আগামীকাল বদলে যেতে পারে।

কুরআন বলে,

> “ নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন।
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:২২২

এখন আমাদের অস্তিত্বের যাত্রা আরও একটু সামনে এগিয়েছে।

আমরা জানলাম—

আদম (আ.)-এর মাধ্যমে মানবজাতির সূচনা হয়েছে।

তাঁর বংশধর হিসেবে আমরা পৃথিবীতে এসেছি।

মায়ের গর্ভে আমাদের সৃষ্টি হয়েছে।

জন্মের পর আমরা ফিতরাতের ওপর পৃথিবীতে এসেছি।

আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত।

পৃথিবীর জীবন পরীক্ষা।

আমাদের সামনে ভালো ও মন্দের পথ রয়েছে।

শয়তান আমাদের বিপথে নিতে চায়।

আল্লাহ হিদায়াত দিয়েছেন।

নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন।

এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের এই জীবন ছেড়ে চলে যেতে হবে।

কিন্তু এখানেই মানুষের সবচেয়ে বড় ভুলটি ঘটে।

মানুষ পৃথিবীতে এমনভাবে বেঁচে থাকে, যেন মৃত্যু অন্য সবার জন্য—তার জন্য নয়।

কিন্তু একদিন এমন একটি মুহূর্ত আসবে, যেদিন তার হাতে থাকা সবকিছু থেমে যাবে।

তার টাকা থাকবে, কিন্তু সে থাকবে না।

তার ঘর থাকবে, কিন্তু সে থাকবে না।

তার মোবাইল থাকবে, তার বই থাকবে, তার কাপড় থাকবে, তার প্রিয় মানুষগুলো থাকবে—কিন্তু সে আর তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না।

যে হৃদয় এতদিন পৃথিবীর জন্য ছুটেছে, একদিন সেটি থেমে যাবে।

আর তখন মানুষের পৃথিবীর জীবনের অধ্যায় শেষ হবে।

কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব শেষ হবে না।

কারণ মৃত্যু ইসলামের দৃষ্টিতে অস্তিত্বের শেষ নয়।

এটি এক জীবন থেকে আরেক জীবনের দিকে যাত্রা।

পরবর্তী পর্বের পথে

পরবর্তী পর্বে আমরা সেই মুহূর্তের দিকে যাব—যে মুহূর্তকে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ একদিন অবশ্যই মুখোমুখি হবে:

মৃত্যু।

মৃত্যুর সময় কী ঘটে?

রূহ কীভাবে দেহ থেকে পৃথক হয়?

মুমিনের রূহের সঙ্গে কী ঘটে?

পাপীর রূহের সঙ্গে কী ঘটে?

মৃত্যুর পর মানুষ কি সবকিছু অনুভব করতে পারে?

আর পৃথিবীর জীবন শেষ হওয়ার পর শুরু হয় যে অদৃশ্য জগত—বরযখ—সেটি আসলে কী?

সেখান থেকেই আমাদের অস্তিত্বের যাত্রা প্রবেশ করবে এক নতুন অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় অংশ

মৃত্যু থেকে চূড়ান্ত গন্তব্য

মৃত্যু, বরযখ, কিয়ামত, হাশর, হিসাব, জান্নাত ও জাহান্নাম

পর্ব ৪ – ৬

পর্ব

৪

যে মুহূর্তে পৃথিবীর জীবন থেমে যায়

মৃত্যু ও রূহের যাত্রা

মানুষ জন্মের পর ধীরে ধীরে বড় হয়।

একসময় সে হাঁটতে শেখে। কথা বলতে শেখে। পৃথিবীকে চিনতে শেখে। স্বপ্ন দেখে। ভালোবাসে। পরিবার গড়ে। নিজের জন্য একটি ভবিষ্যৎ তৈরি করতে চায়।

কিন্তু এই দীর্ঘ পথের শেষেও একটি দরজা আছে—যে দরজা দিয়ে একদিন প্রত্যেক মানুষকে যেতে হবে।

সেই দরজার নাম মৃত্যু।

কেউ এই দরজা এড়িয়ে যেতে পারবে না।

কেউ ধনী বলে এড়িয়ে যাবে না।

কেউ শক্তিশালী বলে নয়।

কেউ জ্ঞানী বলে নয়।

কেউ তরুণ বলে নয়।

আল্লাহ বলেন,

> “ প্রত্যেক প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:১৮৫

আরও বলেন,

> “ তুমি যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের কাছে পৌঁছবেই, যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের মধ্যে থাকো।
>
> — সূরা আন-নিসা, ৪:৭৮

অর্থাৎ মানুষ পৃথিবীতে যত নিরাপত্তাই তৈরি করুক, মৃত্যুর সামনে তার সব ব্যবস্থা একদিন শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু মৃত্যু কী ?

শুধু শরীরের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া ?

নাকি এর পেছনে আরও একটি অদৃশ্য বাস্তবতা রয়েছে ?

কুরআন আমাদের জানায়—মানুষের জীবনের সঙ্গে রূহের গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

> “ আল্লাহ প্রাণসমূহকে তাদের মৃত্যুর সময় গ্রহণ করেন, আর যেগুলো মারা যায়নি, তাদের নিদ্রার সময়।
>
> — সূরা আয-যুমার, ৩৯:৪২

এই আয়াত মৃত্যু ও ঘুমের মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে। মানুষ যখন ঘুমায়, তখন তার পূর্ণ সচেতনতা থাকে না; কিন্তু সে জীবিত থাকে। আর মৃত্যুর সময় তার প্রাণ আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করে।

তবে রূহের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে আল্লাহ বলেন,

> “ বলুন, রূহ আমার রবের আদেশের অন্তর্ভুক্ত; আর তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে অতি সামান্য।
>
> — সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮৫

তাই মৃত্যুর সময় রূহের অদৃশ্য জগতের প্রতিটি মুহূর্ত কীভাবে ঘটে—এমন পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমরা নিজের পক্ষ থেকে তৈরি করতে পারি না। আমরা শুধু কুরআন ও সহিহ হাদিসে যতটুকু জানানো হয়েছে, ততটুকুই বলব।

মৃত্যুর সময় মানুষ এমন এক বাস্তবতার সামনে দাঁড়ায়, যা পৃথিবীতে থাকাকালীন সে দেখতে পেত না।

কুরআন বলে,

> “ অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, ‘হে আমার রব, আমাকে ফেরত পাঠান, যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম।’ কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ।’
>
> — সূরা আল-মুমিনূন, ২৩:৯৯–১০০

এখানে মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো—তওবার সময় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত।

যতক্ষণ মানুষ জীবিত, ততক্ষণ ফিরে আসার সুযোগ আছে।

কিন্তু যখন মৃত্যুর পর্দা নেমে যায়, তখন পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে নতুন আমল করার সুযোগ আর থাকে না।

এই কারণেই রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم মানুষকে মৃত্যুকে স্মরণ করতে বলেছেন।

তিনি বলেছেন,

> “ তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারী বিষয়—মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।
>
> — সুনান আত-তিরমিজি, ২৩০৭; হাদিসটি হাসান হিসেবে বর্ণিত হয়েছে

মৃত্যুর মুহূর্তে কী ঘটে—এ বিষয়ে সহিহ হাদিসে আরও বিস্তৃত বর্ণনা এসেছে।

বারা ইবনু আযিব (রা.)-এর দীর্ঘ হাদিসে রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم মুমিন ও অবিশ্বাসীর মৃত্যুর অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন। হাদিসটি মুসনাদ আহমাদসহ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং এর বিভিন্ন সনদ ও বর্ণনাকে মুহাদ্দিসগণ গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

সেখানে মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের আগমনের কথা এসেছে। তারা তাকে সুসংবাদ দেয় এবং তার রূহ গ্রহণের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

অন্যদিকে পাপী ও অবিশ্বাসীর মৃত্যুর সময় ভয়াবহতার কথা এসেছে।

এখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ—এই বর্ণনাগুলো আমাদের শেখায় যে মৃত্যু শুধু শারীরিক পরিবর্তন নয়; এর সঙ্গে মানুষের রূহেরও একটি অদৃশ্য যাত্রা রয়েছে।

মুমিনের জন্য সেই যাত্রা আল্লাহর রহমতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ হতে পারে।

আর অবিশ্বাসী ও সীমালঙ্ঘনকারীর জন্য তা হতে পারে কঠিন পরিণতির সূচনা।

কুরআন মুমিনদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতাদের একটি বিশেষ কথা উল্লেখ করেছে:

> যারা বলেছে, 'আমাদের রব আল্লাহ', তারপর তারা অবিচল থেকেছে, তাদের কাছে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, দুঃখ করো না; তোমাদের সেই জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছিল।'
>
> — সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৩০

অর্থাৎ, আল্লাহর ওপর ঈমান রেখে অবিচল থাকা মুমিনের জন্য মৃত্যু শুধু অন্ধকারের সমাপ্তি নয়।

বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদের এক নতুন সূচনাও হতে পারে।

কিন্তু অন্যদিকে যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে বা অন্যায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের ব্যাপারে কুরআন কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

> যদি তুমি দেখতে, যখন ফেরেশতারা কাফিরদের প্রাণ গ্রহণ করে, তাদের মুখমণ্ডল ও পিঠে আঘাত করে এবং বলে, 'জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করো!'
>
> — সূরা আল-আনফাল, ৮:৫০

এখানে আবার মনে রাখতে হবে—এগুলো গায়েবের বিষয়। এগুলোকে আমরা পরীক্ষাগারে দেখা কোনো বস্তুগত প্রক্রিয়ার মতো ব্যাখ্যা করব না। এগুলো ওহির মাধ্যমে জানা অদৃশ্য বাস্তবতার অংশ।

মৃত্যুর পর মানুষের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কও বদলে যায়।

সে তার পরিবারকে দেখতে পারে কি না, তাদের কথাবার্তা কতটা জানতে পারে—এসব বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু প্রতিটি প্রচলিত গল্পকে সহিহ দলিল মনে করা ঠিক নয়।

আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা দরকার—মৃত্যুর পর মানুষ বরযখে প্রবেশ করে।

কুরআন বলে,

> “অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসে, সে বলে, ‘হে আমার রব, আমাকে ফেরত পাঠান, যেন আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম।’ কখনো নয়, এটি একটি বাক্য যা সে বলবে। যেদিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সেদিন পর্যন্ত তাদের সামনে থাকবে বরযখ।’
>
> — সূরা আল-মুমিনূন, ২৩:৯৯–১০০

বরযখ (برزخ) অর্থ হলো একটি অন্তরাল বা বাধা, যা দুই অবস্থার মধ্যে পৃথকত্ব সৃষ্টি করে।

ইসলামী পরিভাষায় মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যে মধ্যবর্তী জীবন, তাকে বরযখ বলা হয়।

অর্থাৎ মানুষের যাত্রা এভাবে এগোয়:

পৃথিবীর জীবন → মৃত্যু → বরযখ → পুনরুত্থান।

কিন্তু বরযখ কি সম্পূর্ণ শূন্যতা ?

না।

সহিহ হাদিস থেকে জানা যায়, মৃত্যুর পর মানুষের জন্য কবরের একটি জীবন ও পরীক্ষা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> “যখন কোনো মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে রাখা হয় এবং তার সঙ্গীরা ফিরে যায়, তখন সে তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায়।

এরপর তার কাছে দুই ফেরেশতা এসে তাকে প্রশ্ন করেন।

— সহিহ আল-বুখারি, ১৩৭৪ ; সহিহ মুসলিম, ২৮৭০

প্রশ্নগুলো মূলত তার ঈমান ও তার রব, দ্বীন ও নবী সম্পর্কে তার অবস্থানকে কেন্দ্র করে।

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্যে সঠিক উত্তর দিতে পারবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি সত্যকে গ্রহণ করেনি, সে বিভ্রান্ত হবে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বুঝতে হবে—কবরের প্রশ্ন কোনো সাধারণ পরীক্ষার মতো নয় যেখানে মানুষ পৃথিবীর মতো মুখস্থ উত্তর দিয়ে পার পেয়ে যাবে। মানুষের প্রকৃত ঈমান ও তার জীবনযাপন সেখানে প্রকাশ পাবে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, মুমিন যখন কবরে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, তখন সে সাক্ষ্য দেবে যে তার রব আল্লাহ, তার দ্বীন ইসলাম এবং মুহাম্মদ صلى الله عليه وسلم আল্লাহর রাসূল।

— সহিহ আল-বুখারি, ১৩৭৪ ; সহিহ মুসলিম, ২৮৭০

এরপর তার জন্য কবরের জীবনে শান্তি ও প্রশস্ততার ব্যবস্থা করা হয়।

অন্যদিকে অবিশ্বাসীর জন্য কঠিন পরিণতির কথা এসেছে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, সে প্রশ্নের উত্তরে বলবে—আমি জানি না। তখন তাকে শাস্তির সম্মুখীন করা হবে।

— সহিহ আল-বুখারি, ১৩৭৪ ; সহিহ মুসলিম, ২৮৭০

এখানে আরেকটি বিষয়ও মনে রাখা জরুরি।

আমরা সাধারণত কবর বলতে মাটির নিচের একটি নির্দিষ্ট জায়গাকে বুঝি। কিন্তু বরযখের জীবন শুধু দৃশ্যমান কবরের মাটির সঙ্গে এমনভাবে সীমাবদ্ধ নয় যে যার দেহ কবরস্থ করা হয়নি তার বরযখ থাকবে না। মানুষের মৃত্যুর পরের অবস্থা আল্লাহর গায়েবি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত।

অতএব "কবরের জীবন" বলতে মূলত মৃত্যুর পরের বরযখের জীবন বোঝানো হয়।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে—মৃত ব্যক্তি কি কবরের শাস্তি বা শান্তি সত্যিই অনুভব করে ?

হ্যাঁ, সহিহ হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> "কবর হয় জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান, অথবা জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত।

এই অর্থের বর্ণনা তিরমিজিসহ বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে এসেছে। কবরের শান্তি ও শাস্তি সম্পর্কে সহিহ বর্ণনাও রয়েছে।

আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও নামাজে কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন।

তিনি সাহাবিদের শিখিয়েছেন:

> “ হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের শাস্তি, কবরের শাস্তি, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা এবং দাজ্জালের ফিতনা থেকে আপনার আশ্রয় চাই।
>
> — সহিহ আল-বুখারি, ১৩৭৭; সহিহ মুসলিম, ৫৮৮

এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

মৃত্যুর পরের জীবন কল্পকাহিনি নয়।

এটি ঈমানের অংশ।

তবে বরযখের জীবন পৃথিবীর জীবনের মতো নয়।

সেখানে আমরা পৃথিবীর নিয়মে চলব না।

সেখানে নতুন করে চাকরি করা যাবে না।

ব্যবসা করা যাবে না।

নতুন করে নামাজ আদায় করে আমলনামা পূর্ণ করা যাবে না।

পৃথিবীতে ফিরে এসে ভুল সংশোধনের সুযোগ থাকবে না।

এ কারণেই মৃত্যু আসার আগে আমল করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> “ যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি ছাড়া: সদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।
>
> — সহিহ মুসলিম, ১৬৩১

মানুষ পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় যে কাজগুলো করে যায়, সেগুলোর কিছু প্রভাব মৃত্যুর পরও চলতে পারে।

একটি মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা।

একটি উপকারী বই লেখা।

কাউকে কুরআন শেখানো।

উপকারী জ্ঞান ছড়িয়ে দেওয়া।

সৎ সন্তান তৈরি করা, যে তার জন্য দোয়া করবে।

এগুলো মৃত্যুর পরও মানুষের জন্য সওয়াবের কারণ হতে পারে—যতক্ষণ হাদিসে বর্ণিত সেই ধারাবাহিকতা থাকে।

এখন আমরা আমাদের যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখায় এসে দাঁড়িয়েছি।

একদিকে ছিল পৃথিবী।

সেখানে মানুষ জন্মেছিল।

শিখেছিল।

ভুল করেছিল।

তওবা করেছিল।

নেক আমল করেছিল অথবা পাপে ডুবে গিয়েছিল।

তারপর একদিন মৃত্যু এলো।

দেহ পৃথিবীতে পড়ে রইল।

মানুষ প্রবেশ করল বরযখে।

সেখানে শুরু হলো নতুন এক অপেক্ষা।

কিন্তু অপেক্ষা কিসের ?

কিয়ামতের।

কারণ মানুষের অস্তিত্বের যাত্রা এখানেও শেষ হয়নি।

বরযখ চূড়ান্ত গন্তব্য নয়।

একদিন এমন একটি সময় আসবে, যখন পৃথিবীর এই পরিচিত ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্র, পাহাড়, সমুদ্র—সবকিছু এক মহাবিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে।

তারপর আল্লাহ আবার মানুষকে উঠিয়ে দেবেন।

যে মানুষ একসময় মাটির সামান্য উপাদান থেকে সৃষ্টি হয়েছিল, যে একদিন পৃথিবীর বুকে হাঁটত, যে মৃত্যুর পর কবরে বা বরযখে প্রবেশ করেছিল—সে আবার উঠবে।

কেন?

কারণ তার সামনে এখনো চূড়ান্ত হিসাব বাকি।

সেদিন কেউ তার সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে না।

কেউ তার পদমর্যাদা নিয়ে গর্ব করবে না।

কেউ নিজের সন্তানকে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবে না।

প্রত্যেক মানুষ নিজের পরিণতি নিয়ে চিন্তিত থাকবে।

সেই দিনটির নাম—কিয়ামত।

পরবর্তী পর্বের পথে

পরবর্তী পর্বে আমরা সেই ভয়াবহ অথচ অবধারিত দিনের দিকে এগিয়ে যাব—

কিয়ামত কীভাবে শুরু হবে?

শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হলে কী ঘটবে?

মৃত মানুষ কীভাবে পুনরুত্থিত হবে?

হাশরের ময়দানে মানুষ কেমন অবস্থায় থাকবে?

কেন সেদিন মানুষ নিজের ভাই, মা, বাবা, স্ত্রী ও সন্তান থেকেও দূরে পালাবে?

এবং অবশেষে—মানুষকে কোথায় দাঁড় করানো হবে?

সেখান থেকেই আমাদের অস্তিত্বের যাত্রা প্রবেশ করবে পৃথিবীর জীবনের পরবর্তী ও সবচেয়ে ভয়াবহ অধ্যায়ে—পুনরুত্থান ও হাশর।

পর্ব ৫

পৃথিবী ভেঙে পড়বে

পুনরুত্থান ও হাশরের দিন

একসময় যে মানুষটি পৃথিবীর আলো দেখেছিল, সে মৃত্যুর পর চলে গেছে এমন এক জগতে, যার নাম বরযখ।

সেখানে তার পৃথিবীর কাজের সুযোগ শেষ।

তার আমলনামায় আর নতুন করে পৃথিবীর আমল যোগ হচ্ছে না—তবে সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং নেক সন্তানের দোয়ার মতো কিছু কাজের সওয়াব চলতে পারে।

তারপর শুরু হবে দীর্ঘ অপেক্ষা।

কিন্তু এই অপেক্ষারও একদিন শেষ হবে।

কারণ মৃত্যু মানুষের অস্তিত্বের শেষ নয়।

একদিন আল্লাহ সেই মানুষটিকে আবার উঠিয়ে দেবেন।

যে শরীর একসময় মাটিতে মিশে গিয়েছিল, যে মানুষকে পৃথিবীর মানুষ ভুলে গিয়েছিল, যে কবরের অন্ধকারে চলে গিয়েছিল—আল্লাহ তাকে আবার জীবিত করবেন।

সেদিনই হবে পুনরুত্থানের দিন।

কুরআন আমাদের সেই দিনের কথা বারবার স্মরণ করিয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

> “ অবশ্যই কিয়ামত আসবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং অবশ্যই আল্লাহ কবরবাসীদের পুনরুত্থিত করবেন।
>
> — সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৭

অর্থাৎ কিয়ামত কোনো কল্পকাহিনি নয়।

এটি ভবিষ্যতের নিশ্চিত বাস্তবতা।

কিন্তু তার আগে পৃথিবী ও আকাশের বর্তমান ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে।

আল্লাহ বলেন,

> “ যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেওয়া হবে, যখন নক্ষত্রগুলো ঝরে পড়বে, যখন পর্বতগুলোকে চলমান করা হবে...
>
> — সূরা আত-তাকভীর, ৮১:১–৩

আরেক জায়গায় বলেন,

> “ যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে, যখন নক্ষত্রগুলো ছড়িয়ে পড়বে, যখন সমুদ্রগুলো বিস্ফোরিত/উত্তাল করে দেওয়া হবে এবং যখন কবরগুলো উন্মুক্ত করা হবে—তখন প্রত্যেক প্রাণী জানতে পারবে সে কী আগে পাঠিয়েছে এবং কী পিছনে রেখে এসেছে।
>
> — সূরা আল-ইনফিতার, ৮২:১–৫

এগুলো এমন এক পরিবর্তনের কথা বলে, যা মানুষের পরিচিত পৃথিবীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

আজ আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্য দেখি।

চাঁদ দেখি।

নক্ষত্র দেখি।

পাহাড়কে স্থির মনে হয়।

সমুদ্রকে বিশাল ও শক্তিশালী মনে হয়।

কিন্তু কিয়ামতের দিন এই পরিচিত ব্যবস্থার আর কোনো স্থায়িত্ব থাকবে না।

আল্লাহ বলেন,

> “ যেদিন এ যমীন ভিন্ন যমীনে রূপান্তরিত হবে এবং আসমানসমূহও। আর তারা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে হাযির হবে।
>
> — সূরা ইবরাহিম, ১৪:৪৮

তারপর আসবে সেই মুহূর্ত, যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে।

কুরআন বলে,

> “ আর যেদিন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, তখন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই ভীত হয়ে পড়বে—যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করেন সে ছাড়া। তারপর আবার তাতে ফুঁ দেওয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।

> — সূরা আয-যুমার, ৩৯:৬৮

এখানে কুরআন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার একাধিক পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছে।

সহিহ হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিয়েছেন, শিঙ্গার দায়িত্বে থাকা ফেরেশতা হলেন ইসরাফিল (আ.)—তবে কুরআনে তাঁর নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয়নি। তাই এখানে আমাদের মূল ভিত্তি কুরআনের "শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া"-র বক্তব্য।

প্রথম পর্যায়ে মহাবিপর্যয় ও মৃত্যু আসবে আল্লাহ যাদের জন্য ইচ্ছা করেন তাদের ওপর।

তারপর দ্বিতীয়বার ফুঁ দেওয়া হলে মানুষ পুনরুত্থিত হবে।

আল্লাহ বলেন,

> "তারপর আবার তাতে ফুঁ দেওয়া হবে, তখন তারা দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।
>
> — সূরা আয-যুমার, ৩৯:৬৮

কী আশ্চর্য দৃশ্য হবে সেই দিন!

যে মানুষটি ভাবছিল তার জীবন শেষ হয়ে গেছে, সে আবার উঠে দাঁড়াবে।

যে রাজা মারা গিয়েছিল—সে উঠবে।

যে দরিদ্র মারা গিয়েছিল—সে উঠবে।

যে আলেম মারা গিয়েছিল—সে উঠবে।

যে কৃষক মারা গিয়েছিল—সে উঠবে।

যে শিশু মারা গিয়েছিল—তার বিষয়ও আল্লাহর বিচারের অধীন হবে।

যে মানুষ পৃথিবীতে হাজার বছর আগে মারা গিয়েছিল এবং যে মানুষ কিয়ামতের কিছুক্ষণ আগে মারা যাবে—সবাই আল্লাহর সামনে সমবেত হবে।

কারও পরিচয় হারাবে না।

কারও হিসাব হারাবে না।

কারও আমল হারাবে না।

আল্লাহ বলেন,

> "মানুষ কি মনে করে যে আমি তার হাড়গুলো একত্রিত করতে পারব না? অবশ্যই পারব; বরং আমি তার আঙুলের ডগাগুলো পর্যন্ত যথাযথভাবে পুনর্গঠন করতে সক্ষম।
>
> — সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫:৩–৪

মানুষের কাছে অসম্ভব মনে হতে পারে—মৃত মানুষ কীভাবে আবার জীবিত হবে?

কিন্তু যে আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্য পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন নয়।

আল্লাহ বলেন,

> “ আর তিনিই সৃষ্টির সূচনা করেন তারপর তিনিই এর পুনরাবৃত্তি করবেন। আর এটা তো তাঁর জন্য অধিকতর সহজ। আসমান ও যমীনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।
>
> — সূরা আর-রূম, ৩০:২৭

এখন শুরু হবে মানুষের আরেকটি যাত্রা।

হাশর।

হাশর অর্থ মানুষকে একত্রিত করা।

কিয়ামতের দিন মানুষকে একটি বিশাল সমাবেশে একত্রিত করা হবে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> “ কিয়ামতের দিন মানুষকে খালি পায়ে, উলঙ্গ এবং খৎনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে।

আয়িশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন—তখন কি পুরুষ ও নারী একে অপরের দিকে তাকাবে?

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বললেন,

> “ হে আয়িশা! সেদিনের বিষয়টি এতই ভয়াবহ হবে যে তারা একে অপরের দিকে তাকানোর কথাই চিন্তা করবে না।
>
> — সহিহ আল-বুখারি, ৬৫২৭; সহিহ মুসলিম, ২৮৫৯

এখানে মানুষের পৃথিবীর অহংকার কোথায় গেল?

যে মানুষ পৃথিবীতে নিজের পোশাক নিয়ে গর্ব করত—সেদিন তার শরীরে কোনো পোশাক থাকবে না।

যে মানুষ নিজের সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করত—সেদিন সৌন্দর্যের কথা মনে থাকবে না।

যে মানুষ নিজের পদমর্যাদা নিয়ে অহংকার করত—সেদিন সবাই আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে।

যে মানুষ নিজের সম্পদকে নিরাপত্তা মনে করত—সেদিন সম্পদ তার সঙ্গে থাকবে না।

কুরআন সেই দিনের ভয়াবহতা বোঝাতে বলে,

> “ সেদিন মানুষ তার ভাই থেকে পালাবে, তার মা ও পিতা থেকে, তার স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে। সেদিন প্রত্যেক মানুষের এমন অবস্থা হবে যে, তার নিজের জন্যই যথেষ্ট চিন্তা থাকবে।
>
> — সূরা আবাসা, ৮০:৩৪–৩৭

কেন ?

কারণ সেদিন মানুষের সামনে নিজের হিসাব।

আজ পৃথিবীতে মানুষ অন্যের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত।

কারও টাকা নেই—সে সাহায্য করে।

কারও চাকরি নেই—সে চাকরি খুঁজে দেয়।

কারও বিপদ হলে পরিবার পাশে দাঁড়ায়।

কিন্তু কিয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষ নিজের আমলনামা নিয়ে চিন্তিত থাকবে।

আল্লাহ বলেন,

> “ সেদিন মানুষ বলবে, ‘কোথায় পালানোর জায়গা ?’
>
> — সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫:১০

কিন্তু সেদিন পালানোর জায়গা থাকবে না।

পৃথিবীতে মানুষ অনেক কিছু থেকে পালাতে পারে।

পুলিশ থেকে পালাতে পারে।

মানুষের বিচার থেকে পালাতে পারে।

দেশ ছেড়ে পালাতে পারে।

পরিচয় গোপন করতে পারে।

কিন্তু আল্লাহর বিচার থেকে কোথায় পালাবে ?

আল্লাহ বলেন,

> “ অতঃপর সেদিন না মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, না জিনকে।
>
> — সূরা আর-রহমান, ৫৫:৩৯

তবে এর অর্থ এই নয় যে কিয়ামতের দিন কারও কোনো হিসাব বা জিজ্ঞাসাবাদ হবে না। বরং কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে বোঝা যায়, কিয়ামতের বিভিন্ন পর্যায়ে জিজ্ঞাসাবাদ ও হিসাবের ধরন ভিন্ন হবে। কোনো পর্যায়ে তাদের পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না, আবার অন্য পর্যায়ে তাদের আমল সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

কেউ সহজ হিসাব পাবে।

কেউ কঠিন জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে।

আর কেউ আল্লাহর রহমত ছাড়া ধ্বংস হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> “ যার হিসাব নেওয়া হবে, সে ধ্বংস হবে।

আয়িশা (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কি বলেননি—যাকে ডান হাতে তার আমলনামা দেওয়া হবে, তার সহজ হিসাব হবে?

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم ব্যাখ্যা করলেন—সেটি আসলে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ নয়; বরং তার আমলনামা উপস্থাপন করা হবে।

— সহিহ আল-বুখারি, ১০৩; সহিহ মুসলিম, ২৮৭৬

এ থেকে বোঝা যায়, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো কোনো সাধারণ আদালতের মতো হবে না।

সেখানে মানুষ নিজের কাজ থেকে পালাতে পারবে না।

কুরআন বলে,

> “ আর যারা ঈমান আনে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, আমরা তাদের সাথে তাদের সন্তানদের মিলন ঘটাব এবং তাদের কর্মের কোন অংশই কমাব না। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কামাইয়ের ব্যাপারে দায়ী থাকবে।
>
> — সূরা আত-তূর, ৫২:২১

আর আল্লাহ বলেন,

> “ অতএব তোমার রবের কসম, আমি তাদের সকলকে অবশ্যই জেরা করব, তারা যা করত, সে সম্পর্কে।
>
> — সূরা আল-হিজর, ১৫:৯২–৯৩

এখন মানুষের পৃথিবীর জীবন তার সামনে খুলে দেওয়া হবে।

যে নামাজ সে পড়েছে—তার হিসাব থাকবে।

যে নামাজ সে ছেড়ে দিয়েছে—তারও হিসাব থাকবে।

যে অর্থ সে হালালভাবে উপার্জন করেছে—তার হিসাব থাকবে।

যে অর্থ অন্যায়ভাবে নিয়েছে—তারও হিসাব থাকবে।

যে কথা সে বলেছে—তারও হিসাব থাকবে।

যে মানুষের হৃদয় সে ভেঙেছে—তারও হিসাব থাকবে।

যে ভালো কাজ গোপনে করেছে—সেটিও আল্লাহর কাছে অদৃশ্য ছিল না।

কারণ আল্লাহ বলেন,

> “আর তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন আর যা কিছু তিলাওয়াত কর না কেন আল্লাহর পক্ষ হতে কুরআন থেকে এবং তোমরা যে আমলই কর না কেন, আমি তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি, যখন তোমরা তাতে নিমগ্ন হও। তোমার রব থেকে গোপন থাকে না যমীনের বা আসমানের অণু পরিমাণ কিছুই এবং তা থেকে ছোট বা বড়, তবে (এর সব কিছুই) রয়েছে সুস্পষ্ট কিতাবে।
>
> — সূরা ইউনুস, ১০:৬১

সেদিন মানুষ বুঝতে পারবে—পৃথিবীর জীবন আসলে কত মূল্যবান ছিল।

যে পাঁচ মিনিট সে অকারণে নষ্ট করেছে, তার মূল্য সে বুঝবে।

যে নামাজকে তুচ্ছ মনে করেছে, তার মূল্য বুঝবে।

যে গুনাহকে ছোট মনে করেছে, তার ভয়াবহতা বুঝবে।

যে নেক কাজকে সামান্য মনে করে করেছে, তার মূল্যও দেখতে পাবে।

কুরআন বলে,

> “যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।
>
> — সূরা আয-যিলযাল, ৯৯:৭–৮

তখন মানুষের সামনে আর কোনো গোপনীয়তা থাকবে না।

আল্লাহ বলেন,

> “ নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম। যে দিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষা করা হবে।
>
> — সূরা আত-তারিক, ৮৬:৮–৯

আজ মানুষ নিজের ভেতরের অনেক কিছু মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারে।

কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে ?

কিছুই না।

তারপর আসবে আমলনামা।

মানুষের জীবনের প্রতিটি কাজের রেকর্ড।

কুরআন বলে,

> “ আর আমলনামা রাখা হবে। তখন তুমি অপরাধীদেরকে দেখতে পাবে ভীত, তাতে যা রয়েছে তার কারণে। আর তারা বলবে, ‘হায় ধ্বংস আমাদের ! কী হল এ কিতাবের ! তা ছোট-বড় কিছুই ছাড়ে না, শুধু সংরক্ষণ করে’ এবং তারা যা করেছে, তা হাযির পাবে। আর তোমার রব কারো প্রতি যুলম করেন না।
>
> — সূরা আল-কাহফ, ১৮:৪৯

কিন্তু মুমিনদের মধ্যে এমন মানুষ থাকবে, যাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।

কুরআন বলে,

> “ যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, ‘নাও, আমার আমলনামা পড়ো।’
>
> — সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯:১৯

সে আনন্দিত হবে।

কারণ সে বুঝবে—তার পৃথিবীর জীবন বৃথা যায়নি।

তার নামাজ বৃথা যায়নি।

তার ধৈর্য বৃথা যায়নি।

তার দান বৃথা যায়নি।

তার গোপন কান্না বৃথা যায়নি।

তার আল্লাহভীতি বৃথা যায়নি।

অন্যদিকে যার আমলনামা বাম হাতে বা পেছন দিক থেকে দেওয়া হবে, তার অবস্থা হবে ভয়াবহ।

সে বলবে,

> “ হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা দেওয়া না হতো!
>
> — সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯:২৫

এই পার্থক্যই দেখিয়ে দেবে—পৃথিবীর জীবন আসলে কীসের জন্য ছিল।

কেউ পৃথিবীতে সফল বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু আখিরাতে ব্যর্থ।

কেউ পৃথিবীতে সাধারণ জীবন কাটিয়েছে, কিন্তু আল্লাহর কাছে সফল।

কারণ পৃথিবীর মাপকাঠি আর আখিরাতের মাপকাঠি এক নয়।

কুরআন বলে,

> “ যেদিন তারা তা দেখবে, সেদিন তাদের মনে হবে তারা পৃথিবীতে যেন এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল ছাড়া অবস্থান করেনি।
>
> — সূরা আন-নাযিআত, ৭৯:৪৬

মানুষ তখন বুঝবে—পৃথিবীর জীবন যত দীর্ঘই মনে হোক, আখিরাতের তুলনায় তা কত ক্ষুদ্র।

কিন্তু হাশরের মাঠে শুধু ভয়ই থাকবে না।

আল্লাহর রহমতের দরজাও থাকবে।

সেখানে থাকবে শাফাআত—সুপারিশ।

তবে শাফাআত কারও নিজের ক্ষমতায় হবে না।

আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার জন্য সন্তুষ্ট হবেন, তার ক্ষেত্রেই শাফাআত হবে।

আল্লাহ বলেন,

> “ কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে?
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৫

আর বলেন,

> “ সেদিন কোনো সুপারিশ উপকারে আসবে না, তবে যার জন্য পরম দয়াময় অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন।
>
> — সূরা ত্ব-হা, ২০:১০৯

অর্থাৎ কেউ আল্লাহর সিদ্ধান্তের বাইরে কাউকে রক্ষা করতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যও কিয়ামতের দিন বিশেষ শাফাআতের প্রমাণ সহিহ হাদিসে এসেছে।

মানুষ যখন দীর্ঘ অপেক্ষা ও ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে থাকবে, তখন তারা বিভিন্ন নবীর কাছে যাবে। শেষ পর্যন্ত তারা মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে আসবে এবং তিনি আল্লাহর অনুমতিতে শাফাআত করবেন।

এটি শাফাআতে কুবরা বা বৃহৎ শাফাআত নামে পরিচিত।

— সহিহ আল-বুখারি, ৪৪৭৬; সহিহ মুসলিম, ১৯৩

কিন্তু এখানেও একটি সীমা আছে।

শাফাআত মানে এই নয় যে মানুষ নিজের জীবন যেমন খুশি কাটাবে এবং পরে কারও সুপারিশ তাকে নিশ্চিতভাবে বাঁচিয়ে দেবে।

শাফাআত সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর অনুমতি ও সন্তুষ্টির অধীন।

অতএব পৃথিবীতে আমাদের দায়িত্ব হলো শাফাআতের আশায় গুনাহে ডুবে থাকা নয়; বরং ঈমান ও নেক আমল নিয়ে আল্লাহর রহমত কামনা করা।

এখনও মানুষের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

হিসাব হবে।

আমলনামা দেওয়া হবে।

আল্লাহর বিচার হবে।

তারপর সামনে আসবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—মীযান, অর্থাৎ আমলের ওজন।

মানুষ পৃথিবীতে যে কাজগুলোকে ছোট মনে করেছিল, সেদিন সেগুলোর ওজন প্রকাশ পাবে।

আল্লাহ বলেন,

> “ আর কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের পাল্লা স্থাপন করব। অতএব কোনো ব্যক্তির প্রতি সামান্যও জুলুম করা হবে না।

— সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৪৭

যার পাল্লা ভারী হবে, তার জন্য সফলতা।

আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার জন্য ভয়াবহ পরিণতি।

আল্লাহ বলেন,

> “ যার পাল্লা ভারী হবে, সে থাকবে সন্তোষজনক জীবনে। আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার আবাস হবে হাবিয়া।
>
> — সূরা আল-কারিয়াহ, ১০১:৬–৯

কিন্তু এখানেই যাত্রা শেষ নয়।

হাশরের মাঠ পেরিয়ে মানুষের সামনে আরও একটি পথ থাকবে।

সিরাত।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم-এর সহিহ হাদিসে জাহান্নামের ওপর স্থাপিত সিরাতের কথা এসেছে, যার ওপর দিয়ে মানুষকে অতিক্রম করতে হবে। কেউ দ্রুত অতিক্রম করবে, কেউ ধীরে, কেউ নিজের আমল অনুযায়ী কষ্টের সঙ্গে অতিক্রম করবে।

— সহিহ আল-বুখারি, ৭৪৩৯; সহিহ মুসলিম, ১৮২

সিরাতের বিস্তারিত আকৃতি, এর সব বৈশিষ্ট্য এবং প্রত্যেক মানুষের গতি সম্পর্কে কুরআন ও সহিহ হাদিসে যতটুকু এসেছে, আমরা ততটুকুই বিশ্বাস করব। প্রচলিত অতিরিক্ত গল্প বা অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা দিয়ে এর ছবি আঁকব না।

এখন মানুষের সামনে আর কোনো গোপন পথ নেই।

পৃথিবীর জীবন শেষ।

মৃত্যু পার হয়েছে।

বরযখ পার হয়েছে।

পুনরুত্থান হয়েছে।

হাশর হয়েছে।

আমলনামা এসেছে।

হিসাব হয়েছে।

মীযান হয়েছে।

শাফাআতের বিষয় আল্লাহর অনুমতির অধীন হয়েছে।

সিরাত অতিক্রমের পর্যায় এসেছে।

এবার মানুষ তার চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে যাবে।

একদিকে জান্নাত—

যেখানে আর মৃত্যু নেই।

আরেকদিকে জাহান্নাম—

যেখানে অবিশ্বাস ও আল্লাহর অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে।

কিন্তু জান্নাত কেমন?

জাহান্নাম কেমন?

কাদের জন্য জান্নাত?

কাদের জন্য জাহান্নাম?

জান্নাতে কি মানুষ যা চাইবে তা পাবে?

সেখানে কি মৃত্যু থাকবে?

জাহান্নামের শাস্তি কেমন?

মুমিনদের জন্য কি চিরস্থায়ী জীবন?

আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—

মানুষ কি সত্যিই তার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে যাবে, যেখানে আর কখনো ফিরে আসতে হবে না?

পরবর্তী পর্বের পথে

পরবর্তী পর্বে আমরা মানুষের অস্তিত্বের যাত্রার শেষ অধ্যায়ের দিকে যাব—

জান্নাত ও জাহান্নাম: মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য।

পর্ব

৬

শেষ গন্তব্য

জান্নাত ও জাহান্নাম

মানুষের যাত্রা অনেক দূর এগিয়েছে।

একদিন সে ছিল না।

তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করলেন।

আদম (আ.)-এর মাধ্যমে মানবজাতির সূচনা হলো। প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানুষ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকে মায়ের গর্ভে একটি নির্দিষ্ট সময় কাটিয়ে পৃথিবীতে এলো। কেউ দীর্ঘ জীবন পেল, কেউ অল্প।

তারপর পৃথিবীর জীবন শেষ হলো।

মৃত্যু এলো।

মানুষ বরযখে প্রবেশ করল।

তারপর একদিন কিয়ামত হলো।

মানুষ পুনরুত্থিত হলো।

হাশরের ময়দানে সমবেত হলো।

আমলনামা দেওয়া হলো।

হিসাব হলো।

মীযানে আমল ওজন করা হলো।

আল্লাহর অনুমতিতে শাফাআতের বিষয় এলো।

তারপর মানুষ চূড়ান্ত গন্তব্যের দিকে এগিয়ে গেল।

এবার আর পৃথিবীতে ফিরে আসার সুযোগ নেই।

আর কোনো পরীক্ষা নেই।

আর কোনো তওবার সুযোগ নেই।

আর কোনো নতুন আমল করার সুযোগ নেই।

এবার ফলাফল প্রকাশিত হবে।

আল্লাহ বলেন,

> “ সেদিন মানুষ পৃথক পৃথক অবস্থায় ফিরে আসবে, যাতে তাদেরকে তাদের আমল দেখানো হয়। অতএব যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে; আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।
>
> — সূরা আয-যিলযাল, ৯৯:৬–৮

এই হলো সেই মুহূর্ত, যার জন্য পৃথিবীর পুরো জীবন ছিল প্রস্তুতি।

কিন্তু মানুষের চূড়ান্ত গন্তব্য এক নয়।

কেউ জান্নাতে যাবে।

কেউ জাহান্নামে যাবে।

কুরআন বলে,

> “ প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ‘অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।
>
> — সূরা আলে ইমরান, ৩:১৮৫

খেয়াল করুন—আল্লাহ সফলতার সংজ্ঞা কীভাবে দিয়েছেন।

পৃথিবীর ভাষায় সফলতা মানে হতে পারে অর্থ, শিক্ষা, পদ, খ্যাতি কিংবা ক্ষমতা।

কিন্তু আল্লাহর কাছে প্রকৃত সফলতা হলো—

জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশ।

তাহলে জান্নাত কেমন ?

আমরা যতই কল্পনা করি, জান্নাতের প্রকৃত সৌন্দর্য আমাদের কল্পনার সীমার বাইরে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত করেছেন —

> “ যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয়ে যার কল্পনাও আসেনি।
>
> — সহিহ আল-বুখারি, ৪৭৭৯; সহিহ মুসলিম, ২৮২৪

অর্থাৎ জান্নাতের বাস্তবতা পৃথিবীর কোনো সৌন্দর্যের সঙ্গে পুরোপুরি তুলনা করা যায় না।

পৃথিবীতে আমরা সুন্দর বাগান দেখি।

নদী দেখি।

সমুদ্র দেখি।

ফুল দেখি।

সুন্দর বাড়ি দেখি।

প্রিয় মানুষদের ভালোবাসা পাই।

কিন্তু জান্নাতের সৌন্দর্য এসবের ঊর্ধ্বে।

আল্লাহ বলেন,

> “ যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তুমি তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীসমূহ। যখনই তাদেরকে জান্নাত থেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে, তারা বলবে, ‘এটাই তো পূর্বে আমাদেরকে খেতে দেয়া হয়েছিল’। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করে এবং তাদের জন্য তাতে থাকবে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে হবে স্থায়ী।
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:২৫

জান্নাতে নদী থাকবে।

বাগান থাকবে।

সুন্দর বাসস্থান থাকবে।

নিরাপত্তা থাকবে।

কোনো ভয় থাকবে না।

কোনো দুঃখ থাকবে না।

কোনো অসুস্থতা থাকবে না।

কোনো বার্ধক্য থাকবে না।

সবচেয়ে বড় কথা—মৃত্যু থাকবে না।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন, জান্নাতবাসীদের বলা হবে—

> “ হে জান্নাতবাসী ! তোমাদের জন্য জীবন আছে, আর কোনো মৃত্যু নেই ; তোমাদের জন্য সুস্থতা আছে, আর কোনো অসুস্থতা নেই ; তোমাদের জন্য যৌবন আছে, আর কোনো

> বার্ধক্য নেই; তোমাদের জন্য সুখ আছে, আর কোনো দুঃখ নেই।
>
> — সহিহ মুসলিম, ২৮৫০

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্তও একসময় শেষ হয়ে যায়।

শৈশব শেষ হয়।

যৌবন শেষ হয়।

প্রিয় মানুষ মারা যায়।

সুখের দিন বদলে যায়।

কিন্তু জান্নাতে এমন হবে না।

সেখানে শেষ বলে কিছু থাকবে না।

আল্লাহ বলেন,

> “ তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:২৫

আর জান্নাতবাসীদের অন্তর থেকেও আল্লাহ দুঃখ ও বিদ্বেষ দূর করে দেবেন।

আল্লাহ বলেন,

> “ আমি তাদের অন্তর থেকে বিদ্বেষ দূর করে দেব; তারা ভাই ভাই হয়ে পরস্পরের মুখোমুখি আসনে বসবে।
>
> — সূরা আল-হিজর, ১৫:৪৭

পৃথিবীতে মানুষের অন্তরে কত কষ্ট!

অভিমান।

হিংসা।

রাগ।

বিরোধ।

ভুল বোঝাবুঝি।

কিন্তু জান্নাতে মানুষের অন্তর হবে পরিশুদ্ধ।

সেখানে থাকবে শান্তি।

আল্লাহ বলেন,

> “ তারা সেখানে ‘শান্তি’ ছাড়া কোন অর্থহীন কথা শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে তাদের রিযক।
>
> — সূরা মারইয়াম, ১৯:৬২

আর তাদের প্রতি ফেরেশতারা সালাম জানিয়ে প্রবেশ করবে।

কুরআন বলে,

> “ ফেরেশতারা তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে, ‘তোমাদের ওপর শান্তি ; তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ। কতই না উত্তম এই চূড়ান্ত আবাস !’
>
> — সূরা আর-রাদ, ১৩:২৩–২৪

কিন্তু জান্নাতের সব নিয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে বড় নিয়ামত কী ?

এখানে এসে মানুষের পৃথিবীর ভাষা যেন থেমে যায়।

কারণ জান্নাতের সবচেয়ে বড় পুরস্কার শুধু বাগান, নদী, খাদ্য, বাসস্থান বা আনন্দ নয়।

সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁকে দেখার সৌভাগ্য।

আল্লাহ বলেন,

> “ সেদিন কিছু মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।
>
> — সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫:২২–২৩

এটি আহলুস সুন্নাহর আকীদার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—মুমিনরা আখিরাতে আল্লাহকে দেখবে। এর প্রকৃত ধরন আমাদের অজানা ; তবে কুরআন ও সহিহ হাদিসে এর প্রমাণ রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> “ তোমরা তোমাদের রবকে এমনভাবে দেখতে পাবে যেমন তোমরা এই চাঁদকে দেখতে পাচ্ছ—তাঁকে দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।
>
> — সহিহ আল-বুখারি, ৭৪৩৪ ; সহিহ মুসলিম, ৬৩৩

এটি পৃথিবীর চোখে আল্লাহকে দেখার মতো নয় এবং আল্লাহর সৃষ্টির সঙ্গে কোনো তুলনাও করা যাবে না। কীভাবে হবে—তা আল্লাহই ভালো জানেন।

তাই জান্নাতের সবচেয়ে বড় আনন্দ হলো—আল্লাহর সন্তুষ্টি।

আল্লাহ বলেন,

> “ আর আল্লাহর সন্তুষ্টিই সবচেয়ে বড়।
>
> — সূরা আত-তাওবা, ৯:৭২

এখন অন্যদিকে তাকানো যাক।

যারা ঈমান প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আল্লাহর অবাধ্যতায় জীবন শেষ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম।

কুরআন জাহান্নামের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন,

> “ নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে এবং কাফির অবস্থায় মারা গেছে, তাদের ওপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তারা তাতে চিরকাল থাকবে; তাদের শাস্তি হালকা করা হবে না এবং তাদের অবকাশও দেওয়া হবে না।
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:১৬১–১৬২

জাহান্নাম কোনো প্রতীকী ধারণা নয়।

এটি বাস্তব।

আগুন বাস্তব।

শাস্তি বাস্তব।

কুরআন বলে,

> “ তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো, যার ইন্ধন মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।
>
> — সূরা আল-বাকারা, ২:২৪

আবার আল্লাহ বলেন,

> “ নিশ্চয় জাহান্নাম গোপন ফাঁদ।
>
> — সূরা আন-নাবা, ৭৮:২১

জাহান্নামের শাস্তি শুধু শারীরিক কষ্টের বিষয় নয়; সেখানে অপমান, অনুতাপ, ভয় ও হতাশাও থাকবে।

সেখানে মানুষ আফসোস করবে।

কুরআন তাদের একটি কথা উল্লেখ করেছে:

> “ হায়! আমরা যদি শুনতাম অথবা বুঝতাম, তবে আমরা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হতাম না।
>
> — সূরা আল-মুলক, ৬৭:১০

কিন্তু তখন আফসোস কোনো কাজে আসবে না।

কারণ পৃথিবীতে থাকতেই তাকে সতর্ক করা হয়েছিল।

তাকে চিন্তার শক্তি দেওয়া হয়েছিল।

নবী-রাসূল এসেছিলেন।

আসমানি কিতাব এসেছে।

সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তারপরও যদি মানুষ সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে আখিরাতে তার পরিণতি ভয়াবহ হবে।

তবে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পরিষ্কার করা দরকার।

প্রত্যেক পাপী মুসলিমের পরিণতি কাফিরের মতো নয়।

আহলুস সুন্নাহর আকীদা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি ঈমান নিয়ে মারা গেলে কিন্তু বড় গুনাহে লিপ্ত থাকলে তার ব্যাপার আল্লাহর ইচ্ছাধীন। আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন, আবার চাইলে ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে শাস্তি দিতে পারেন। তবে তাওহিদের ওপর মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে থাকবে না—এ বিষয়ে সহিহ হাদিসে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ صلى الله عليه وسلم বলেছেন,

> “ যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে, তাকে আগুন থেকে বের করে আনা হবে।
>
> — সহিহ আল-বুখারি, ৭৪৪০; সহিহ মুসলিম, ১৮৪

এখানে আমাদের ভয় ও আশার মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে।

শুধু আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করে গুনাহকে হালকা মনে করা যাবে না।

আবার নিজের গুনাহ দেখে আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হওয়াও যাবে না।

আল্লাহ নিজেই বলেন,

> “ বলুন, ‘হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু’।’
>
> — সূরা আয-যুমার, ৩৯:৫৩

এই আয়াত মানুষকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আশার দরজা খোলা থাকার কথা মনে করিয়ে দেয়।

কিন্তু সেই দরজা পৃথিবীর জীবন শেষ হওয়ার সঙ্গে বন্ধ হয়ে যাবে।

তখন আর তওবা করার সুযোগ থাকবে না।

তখন মানুষ বলবে—

> “ হে আমার রব! আমাকে ফিরিয়ে দিন, যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি।

কিন্তু তাকে বলা হবে—

> “ কখনো নয়!
>
> — সূরা আল-মুমিনূন, ২৩:৯৯–১০০

তাই আজকের একটি তওবা আগামীকালের হাজার আফসোসের চেয়ে মূল্যবান।

আজকের একটি নামাজ আগামীকালের অনুতাপের চেয়ে মূল্যবান।

আজকের একটি গোপন নেক আমল কিয়ামতের দিনের বড় সম্পদ হতে পারে।

আজ কাউকে ক্ষমা করে দেওয়া, আজ কারও হক ফিরিয়ে দেওয়া, আজ হারাম ছেড়ে দেওয়া—এসবই হয়তো সেই দিনের জন্য প্রস্তুতি।

মানুষ পৃথিবীতে যখন ছিল, তখন সে ভাবত—“আমার সামনে অনেক সময় আছে।”

কিন্তু মৃত্যুর পর সে বুঝবে—সময় ছিল খুব অল্প।

কুরআন বলে,

> “ তারা সেখানে চিৎকার করে বলবে, ‘হে আমাদের রব! আমাদের বের করে দিন; আমরা আগে যা করতাম তার পরিবর্তে সৎকাজ করব।’

তখন তাদের বলা হবে—

> “ আমি কি তোমাদেরকে এতটা সময় দিইনি, যাতে যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে ?
>
> — সূরা ফাতির, ৩৫:৩৭

তখন আর সময় থাকবে না।

পৃথিবীর ঘড়ি থেমে গেছে।

আমলনামা বন্ধ হয়ে গেছে।

জীবনের পরীক্ষা শেষ।

ফলাফল প্রকাশিত।

মানুষ তার চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছে গেছে।

আর তখন সে বুঝবে—পৃথিবীতে যে জীবনকে সে এত বড় মনে করেছিল, সেটি আসলে কত ছোট ছিল।

আল্লাহ বলেন,

> “ আর আখিরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন—যদি তারা জানত !
>
> — সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:৬৪

এখন আমাদের পুরো যাত্রাটিকে একবার পেছন ফিরে দেখা যাক।

একসময় মানুষ ছিল না।

আল্লাহ আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন।

মানবজাতির সূচনা হলো।

আদম (আ.) ও তাঁর বংশধরদের পৃথিবীর জীবনের জন্য নির্ধারণ করা হলো।

মানুষ মায়ের গর্ভে এল।

জন্ম নিল।

শৈশব পার করল।

যৌবন এলো।

কেউ ঈমানের পথ নিল, কেউ অবাধ্যতার।

কেউ আল্লাহকে স্মরণ করল, কেউ ভুলে গেল।

কেউ তওবা করল, কেউ অহংকারে অটল রইল।

তারপর একদিন মৃত্যু এলো।

মানুষ বরযখে প্রবেশ করল।

তারপর কিয়ামত হলো।

মানুষ পুনরুত্থিত হলো।

হাশরের ময়দানে দাঁড়াল।

আমলনামা প্রকাশিত হলো।

হিসাব হলো।

মীযানে আমল ওজন হলো।

আল্লাহর অনুমতিতে শাফাআত হলো।

তারপর চূড়ান্ত গন্তব্য নির্ধারিত হলো।

জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

এটাই মানুষের অস্তিত্বের সেই দীর্ঘ যাত্রা, যার শুরু পৃথিবীর জন্মেরও আগে আল্লাহর সৃষ্টির জ্ঞানের মধ্যে, আর যার পৃথিবীব্যাপী অধ্যায় শেষ হয়ে যায় মৃত্যুর মাধ্যমে—কিন্তু যার চূড়ান্ত পরিণতি আখিরাতে।

উদ্ধৃত সূত্রসমূহ

প্রতিটি পর্বে যে সূত্রগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, পর্ব অনুযায়ী সেগুলোর তালিকা।

পর্ব ১ · একেবারে শুরু

- সূরা আল-বাকারা, ২:৩০
- সূরা সোয়াদ, ৩৮:৭১
- সূরা আলে ইমরান, ৩:৫৯
- সূরা আল-হিজর, ১৫:২৮
- সূরা আস-সাজদাহ, ৩২:৭
- সূরা আল-হিজর, ১৫:২৯
- সূরা আল-বাকারা, ২:৩৪
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১২
- সূরা আল-বাকারা, ২:৩১
- সূরা আল-বাকারা, ২:৩২
- সহিহ আল-বুখারি, হাদিস ৩৩২৬
- সূরা ত্ব-হা, ২০:১১৭
- সূরা ত্ব-হা, ২০:১২২
- সূরা ত্ব-হা, ২০:১২৩
- সূরা আন-নিসা, ৪:১

পর্ব ২ · জন্মের আগের আমি

- সূরা আল-ইনসান, ৭৬:১
- সূরা আল-মুমিনূন, ২৩:১৩
- সূরা আল-মুমিনূন, ২৩:১৪
- সহিহ আল-বুখারি, ৩২০৮; সহিহ মুসলিম, ২৬৪৩
- সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮৫
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৭২
- সূরা আল-মুলক, ৬৭:১-২
- সহিহ আল-বুখারি ও সহিহ মুসলিম

- সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬

পর্ব ৩ · কেন পৃথিবীতে এলাম?

- সূরা আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬
- সূরা আল-মুলক, ৬৭:১–২
- সহিহ মুসলিম, ২৫৬৪
- সূরা আল-বাকারা, ২:১৫৫
- সূরা আল-মুলক, ৬৭:১৩–১৪
- সূরা আয-যিলযাল, ৯৯:৭–৮
- সূরা আল-হাদীদ, ৫৭:২০
- সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:৬৪
- সূরা ত্ব-হা, ২০:১২৩
- সূরা আন-নাহল, ১৬:৩৬
- সহিহ আল-বুখারি, ৩৪৪৩
- সূরা আল-আ'রাফ, ৭:১৬
- সূরা আল-বাকারা, ২:২২২

পর্ব ৪ · যে মুহূর্তে পৃথিবীর জীবন থেমে যায়

- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৮৫
- সূরা আন-নিসা, ৪:৭৮
- সূরা আয-যুমার, ৩৯:৪২
- সূরা আল-ইসরা, ১৭:৮৫
- সূরা আল-মুমিনূন, ২৩:৯৯–১০০
- সুনান আত-তিরমিজি, ২৩০৭; হাদিসটি হাসান হিসেবে বর্ণিত হয়েছে
- সূরা ফুসসিলাত, ৪১:৩০
- সূরা আল-আনফাল, ৮:৫০
- সহিহ আল-বুখারি, ১৩৭৪; সহিহ মুসলিম, ২৮৭০
- সহিহ আল-বুখারি, ১৩৭৭; সহিহ মুসলিম, ৫৮৮
- সহিহ মুসলিম, ১৬৩১

পর্ব ৫ · পৃথিবী ভেঙে পড়বে

- সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৭
- সূরা আত-তাকভীর, ৮১:১–৩

- সূরা আল-ইনফিতার, ৮২:১–৫
- সূরা ইবরাহিম, ১৪:৪৮
- সূরা আয-যুমার, ৩৯:৬৮
- সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫:৩–৪
- সূরা আর-রূম, ৩০:২৭
- সহিহ আল-বুখারি, ৬৫২৭; সহিহ মুসলিম, ২৮৫৯
- সূরা আবাসা, ৮০:৩৪–৩৭
- সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫:১০
- সূরা আর-রহমান, ৫৫:৩৯
- সহিহ আল-বুখারি, ১০৩; সহিহ মুসলিম, ২৮৭৬
- সূরা আত-তূর, ৫২:২১
- সূরা আল-হিজর, ১৫:৯২–৯৩
- সূরা ইউনুস, ১০:৬১
- সূরা আয-যিলযাল, ৯৯:৭–৮
- সূরা আত-তারিক, ৮৬:৮–৯
- সূরা আল-কাহফ, ১৮:৪৯
- সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯:১৯
- সূরা আল-হাক্কাহ, ৬৯:২৫
- সূরা আন-নাযিআত, ৭৯:৪৬
- সূরা আল-বাকারা, ২:২৫৫
- সূরা ত্ব-হা, ২০:১০৯
- সহিহ আল-বুখারি, ৪৪৭৬; সহিহ মুসলিম, ১৯৩
- সূরা আল-আম্বিয়া, ২১:৪৭
- সূরা আল-কারিয়াহ, ১০১:৬–৯
- সহিহ আল-বুখারি, ৭৪৩৯; সহিহ মুসলিম, ১৮২

পর্ব ৬ · শেষ গন্তব্য

- সূরা আয-যিলযাল, ৯৯:৬–৮
- সূরা আলে ইমরান, ৩:১৮৫
- সহিহ আল-বুখারি, ৪৭৭৯; সহিহ মুসলিম, ২৮২৪
- সূরা আল-বাকারা, ২:২৫
- সহিহ মুসলিম, ২৮৫০
- সূরা আল-হিজর, ১৫:৪৭

- সূরা মারইয়াম, ১৯:৬২
- সূরা আর-রাদ, ১৩:২৩–২৪
- সূরা আল-কিয়ামাহ, ৭৫:২২–২৩
- সহিহ আল-বুখারি, ৭৪৩৪ ; সহিহ মুসলিম, ৬৩৩
- সূরা আত-তাওবা, ৯:৭২
- সূরা আল-বাকারা, ২:১৬১–১৬২
- সূরা আল-বাকারা, ২:২৪
- সূরা আন-নাবা, ৭৮:২১
- সূরা আল-মুলক, ৬৭:১০
- সহিহ আল-বুখারি, ৭৪৪০ ; সহিহ মুসলিম, ১৮৪
- সূরা আয-যুমার, ৩৯:৫৩
- সূরা আল-মুমিনূন, ২৩:৯৯–১০০
- সূরা ফাতির, ৩৫:৩৭
- সূরা আল-আনকাবূত, ২৯:৬৪

মানুষের অস্তিত্বের যাত্রা

কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে

সংকলন ও সম্পাদনা: ইহছানুল হক ছাজিদ